গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ২ - ৮ জুন, ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সংরক্ষণ নিয়ে মোহ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন

সিপিএম, বিজেপি সহ সকল পার্লামেন্টারি দলের সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে তফশিলি জাতি, উপজাতি ছাড়াও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আগামী বছর থেকে তা কার্যকর করার কথাও ঘোষণা করেছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, আই আই টি এবং আই আই এম প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আরও ২৭ শতাংশ আসন অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের (ওবিসি) জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিংহ এই ঘোষণা করার পরই দিল্লি, মুম্বাইসহ দেশের নানা প্রান্তে ছাত্রবিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীদের দিয়েই যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, ধীরে ধীরে তাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট ও অন্যান্য কোর্সের ছাত্রছাত্রীরাও সামিল হয়েছে। প্রায় এক মাস ধরে মিটিং, মিছিল, ক্লাস বয়কট, আউটডোর বয়কট প্রভৃতির কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সংরক্ষণবিরোধী ছাত্রবিক্ষোভ ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের বেশ কয়েকটি জায়গায় আবার সংরক্ষণপন্থী ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভও সংগঠিত হয়েছে। পরিণতিতে যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে, কোথাও কোথাও তা সংরক্ষণপন্থীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে যে ছাত্রছাত্রীরা গতকালও নিজেদের মধ্যে জাত-পাতের বিভেদের কথা চিন্তায়ও আনেনি, তাদের মধ্যে এখন পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও ঘৃণার মনোভাব তৈরি হয়েছে। এর থেকে দুঃখজনক ও বিপজ্জনক আর কী হতে পারে! এমনকী বহু গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনের পীঠস্থান এই পশ্চিমবাংলাতেও একই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। সব মিলিয়ে সারা দেশেই পরিস্থিতি আজ অত্যন্ত অগ্নিগর্ভ।

সংরক্ষণ ইস্যু নতুন করে খুঁচিয়ে তুলে জনগণের ঐক্য ভাঙা এবং এডস্ নিবারণের নামে বিজ্ঞাপনে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবাদে ২৫ মার্চ এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস-এর মিছিল

সরকার যদি সত্যিই দায়িত্বশীল হত, তবে এরকম একটা পরিস্থিতিকে যথাযথভাবে সামাল দেওয়ার জন্য আন্তরিক তৎপরতার সাথে উদ্যোগ নিত। তার পরিবর্তে সংরক্ষণবিরোধী ও সংরক্ষণপন্থী উভয় অংশের ছাত্রদের বিক্ষোভের ওপর সরকারি দমনপীড়ন ও পুলিশি অত্যাচার পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে তুলেছে। অন্যদিকে সরকার এই ঘৃণ্য বিভেদের মনোভাবকে, বর্ণবিদ্বেষের পরিবেশকেই আরও খুঁচিয়ে দিচ্ছে। বাণিজ্যমন্ত্রী কমলনাথ বলেছেন, ''বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এই আসন সংরক্ষণ কার্যকর করা হবে।'' এক্ষেত্রে যে সাংবিধানিক বাধা ছিল, তা দূর করতে গত ২০ জানুয়ারি লোকসভায় সকল দলের সমর্থনে সংবিধানের ৯৩তম সংশোধনী পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি থেকে শুরু করে সকল দলের নেতারা বলেছেন, সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করতে তাঁরা দায়বদ্ধ।

দুয়ের পাতায় দেখুন

শেয়ার বাজারে ধস আবার দেখাল এই সরকার গরিবের নয়

'কালো সোমবার' বলে চিহ্নিত ২২ মে ভারতের শেয়ার বাজারের সূচক আচমকা গোঁত্তা খেয়ে পড়ার পরই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম সাত তাড়াতাড়ি বলেছেন — আশঙ্কার কিছু নেই, দেশের অর্থনীতি মজবুত বনিয়াদের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। একদিনে শেয়ারের দাম ১০ শতাংশের বেশি পড়ে যাওয়ায় শেয়ার সম্পদের মোট মূল্য ৫,৪০,০০০ কোটি টাকা কমে গিয়েছে। ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। কারণ তাঁরা যে দামে শেয়ার কিনেছেন, বাজারে তার চেয়ে দাম পড়ে গিয়েছে। ঠিক দু'বছর আগে কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকার গদিতে বসার পর পরই, ১৭ মে ২০০২, শেয়ার বাজারে এরকম একটা ধস নেমেছিল। তখনও সরকার আশ্বস্ত করেছিল, বলেছিল, আতঙ্কের কিছু নেই, অর্থনীতির বনিয়াদ মজবুত। দু'বছর যেতে না যেতেই শেয়ার বাজারে আবার ধস নামল শুধু নয়, শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বার ধস ঠেকাতে বেচাকেনা একঘণ্টা স্থগিত করতে হয়েছিল।

কিন্তু এতে দেশের বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ, যাঁরা শেয়ারে টাকা খাটান না, তাঁদের কী যায় আসে? এদেশের ৮০ ভাগ মানুষ দু-বেলা পেটপুরে খেতেই পান না, সঞ্চয় বলতেও তাঁদের কিছু নেই, কাজেই কোন বিনিয়োগই তাঁরা করতে পারেন না। নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষও সাধারণভাবে ঝুঁকি এড়াবার জন্য ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে টাকা রাখার চেষ্টা করেন। শেয়ার বাজারে আনাগোনা ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদিও ব্যাঙ্ক, ডাকঘরে সুদ কমিয়ে সরকার জনগণকে শেয়ারবাজারের দিকে ঠেলছে ফলে শেয়ারে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বাড়ছে। তবুও এই সংখ্যা এখনও ৭ শতাংশ ছাড়ায়নি। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে — শেয়ার বাজার চড়ুক বা ধসে পড়ুক তাতে সাধারণ মানুষের কী যায় আসে? আর সাধারণ মানুষের যাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারই বা কী? বাস্তব অবস্থা থেকে যাঁরা অভিজ্ঞতা নেন, তাঁরাই জানেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতি চাপের মুখে বা সঙ্কটে পড়লেই শাসক বুর্জোয়া দল ও সরকার সেই সঙ্কটের বোঝা মূল্যবৃদ্ধি, ট্যাক্সবৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। শেয়ার বাজারের সঙ্কটের বোঝাও জনগণের ঘাড়েই চাপবে। যদি আন্দোলনের চাপে সাধারণ মানুষ বুর্জোয়া দল ও সরকারের চক্রান্ত রুখে দিতে না পারেন তবে তাঁদের জীবনের দুঃখকষ্ট আরও বাড়বে। অর্থনীতির যে কোন সঙ্কটের চেহারা ও তার ফলাফল বিচার করলেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জনবিরোধী শোষণমূলক চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা বোঝার জন্য জানা দরকার ঠিক কীভাবে ধস নেমেছিল শেয়ার বাজারে।

কেন শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে

ঠিক কী কারণে শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে তা নিয়ে বাজার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া (২৩ মে) ধসের একটা ধারাবিবরণী দিয়েছে। বস্তুত গত ১৫ মে থেকেই শেয়ার বাজার নামতে শুরু করেছিল। কেন্দ্রের সরকারি কর্তারা অহরহ আমাদের বোঝান — দেশের অর্থনীতির স্বাস্থ্য যে

পাঁচের পাতায় দেখুন

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি কি আদৌ প্রয়োজন?

সিপিএমের সমর্থনে টিকে থাকা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার আবারও কর-দর-মূল্যবৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত জনসাধারণের উপর পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপাতে চলেছে। বিগত ২৪ মাসে তারা পাঁচবার দাম বাড়িয়েছে। খুব শীঘ্রই আবার দাম বাড়ানোর প্রস্তুতি চলছে। নতুন করে এই মূল্যবৃদ্ধির সত্যিই কি কোন প্রয়োজন আছে? আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কত বেড়েছে ? সেই অনুযায়ী ভারতে তেলের দাম কত হওয়া উচিত এ সম্পর্কে জনগণের কাছে সরকার পরিষ্কার করে কিছু বলছে না। যখন আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ৪২ ডলার এবং কলকাতায় পেট্রল বিক্রি হত লিটার প্রতি ৪২.১০ টাকায়, সেই সময় কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মণিশংকর আইয়ার বলেছেন, সব কর তুলে দিলে ১৭.৪৬ টাকায় এক লিটার পেট্রল এবং ১৮.০৭ টাকায় এক লিটার ডিজেল পাওয়া যায় (সূত্র ঃ সংবাদ প্রতিদিন ৮-১২-০৪)। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার মিলে পেট্রলে ২৪.৬৪ টাকা এবং ডিজেলে ১০.৬৫ টাকা লিটার প্রতি ট্যাক্স আদায় করে। বর্তমানে শোনা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক

সাতের পাতায় দেখুন

সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের বেপরোয়া জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ মে এক বিবৃতিতে বলেন — ''সি পি এম পরিচালিত ফ্রন্ট পুনরায় ক্ষমতায় বসার সাথে সাথে চটকলের মালিকরা মিল বন্ধ করে কয়েক হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করেছে। সরকার পরিচালিত বেশ কিছু কারখানা ও প্রতিষ্ঠান হয় বন্ধ, নতুবা প্রাইভেট মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করতে চলেছে। দমদম বিমানবন্দরকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে আধুনিকীকরণের নামে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের উদ্যোগ নিয়েছে। 'শিল্পায়ন'-এর অজুহাতে লক্ষ লক্ষ চাষীকে জমি থেকে উৎখাত করতে যাচ্ছে। অন্যদিকে এডস্ নিবারণের অজুহাতে গোটা রাজ্যের রাস্তায় রাস্তায় ও সংবাদমাধ্যমে অশ্লীল বিজ্ঞাপন দিচ্ছে।

''দেশি-বিদেশি পুঁজির আশীর্বাদে সপ্তমবার গদিতে বসে সিপিএম নেতৃত্ব আরও বেপরোয়াভাবে জনবিরোধী কার্যক্রম নিচ্ছে। এটা খুবই উদ্বেগজনক। আমরা রাজ্য সরকারের এইসব জনবিরোধী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করছি এবং জনসাধারণকে আমাদের দল পরিচালিত প্রতিবাদ আন্দোলনগুলিতে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।''

সংরক্ষণ নিয়ে মোহ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন

একের পাতার পর

কিন্তু তাদের এই 'দায়বদ্ধতা' দেশের ছাত্র সমাজের মধ্যে বর্ণবিদ্বেষের যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাকে নেভানোর জন্য কি তাদের কোন দায় নেই?

সরকারের এই দায়বদ্ধতার দিকটি বিচারে ফেললেই একটা গভীর প্রশ্ন দেখা দেয়। শুধু কংগ্রেস নয়, উল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলির যারাই যেখানে সরকারে আছে, সেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা বেপরোয়াভাবে উদারীকরণ, বেসরকারীকরণের নীতি কার্যকর করে চলেছে। এমনকী স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো মানুষের জীবনের অপরিহার্য বিষয়কেও দেশি-বিদেশি পুঁজির মুনাফা লুট করার মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করে দিচ্ছে, বিপুল পরিমাণ ফি-বৃদ্ধি ও ডোনেশন চালু করাচ্ছে, ক্যাপিটেশন ফি'র নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায়ের ফিকির বের করছে, এন আর আই কোটা চালু করছে এবং তা করার সময় গরিব-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের আর্থিক অবস্থার কোনও তোয়াক্কাই করছে না। এসবই তো সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে। এইসময় হঠাৎ অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়ার নামে আসন সংরক্ষণে এরা এত ব্যগ্র হয়ে পড়ল কেন? পশ্চাদপদ বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতি মমতা থেকেই কি সরকারের এই পদক্ষেপ? সরকার কি সত্যসত্যই শিক্ষায় পিছিয়ে-পড়া, অর্থনৈতিকভাবে শোষিত ও চরম দরিদ্র এই অংশের মানুষকে কিছুটা নিরাপত্তা দিতে, তাদের উন্নত করতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে? হাজারো সমস্যায় জর্জরিত দেশের জনগণ কি এই মুহূর্তে এটাই প্রয়োজন বলে দাবি করেছিল? এ প্রশ্ন উঠবেই। কারণ, যে শিক্ষার সংরক্ষণের জন্য এতসব তোড়জোড়, সেই শিক্ষাই সরকারি নীতির ফলে কীভাবে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, তা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। উচ্চশিক্ষা তো মুষ্টিমেয় বিত্তবানদের জন্য ইতিমধ্যেই সংরক্ষিত হয়ে গেছে, যেখানে হাত বাড়ানো অগ্রসর অথবা অনগ্রসর উভয় অংশের গরিব মানুষের পক্ষেই অলীক কল্পনা। আসলে সরকার আসন সংরক্ষণের দ্বারা বঞ্চিত মানুষকে আশার ছলনার জালে ফাঁসিয়ে দিয়ে অন্য মতলব হাসিল করতে চায়।

শোষণ বঞ্চনার করুণ ইতিহাস

আমাদের দেশে তপশীলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সমস্যাটি অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায় এবং জনগোষ্ঠীর চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তপশীলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ যুগ যুগ ধরে যে নিদারুণ শোষণবঞ্চনা ও অত্যাচারের শিকার হয়েছেন তার ইতিহাস বড়ই করুণ। শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয়, সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকেও এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ যে অবমাননা কুড়িয়েছেন, জীবনে চলার পথে যে নির্দয় উপেক্ষা পেয়েছেন তা বর্ণনাতীত। ভারতবর্ষের বর্ণভেদ প্রথার বিশদ ইতিহাস এখানে পর্যালোচনা না করলেও এ সত্য সকলকেই স্বীকার করতে হবে। প্রথমে সামন্ততন্ত্র ও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনে এই সম্প্রদায়ের মানুষই সবচেয়ে বেশি শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছেন। আবার এদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে প্রথম অবস্থায় আদিবাসী জনগণই এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাদের সাথে অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের গরিব মানুষও সামিল হয়েছিলেন। সিধো-কানহু এবং বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে সংগ্রাম স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লেখা আছে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে ধর্ম-বর্ণ-জনজাতি নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে সামিল করে উন্নত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যেকার এই বিভেদকে নির্মূল করার বাস্তব অবস্থা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব মূলত আপোষকামী বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে থাকায় সামন্ততন্ত্র ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা হতে থাকে। ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, মাস্টারদা, নেতাজী প্রমুখ বিপ্লবীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আপোষহীন বিপ্লবী ধারা সক্রিয় থাকলেও যথার্থ মার্কসবাদী দল ও নেতৃত্বের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আপোষমুখী ধারাই প্রাধান্য পায়। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন সামগ্রিকভাবে জাতপাত-ধর্মবর্ণের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তারই ফলশ্রুতিতে পুরো স্বাধীনতা আন্দোলনটাই শুধু হিন্দু ধর্মভিত্তিক থেকে গেল তাই নয়, এই আন্দোলনের নেতৃত্বেও উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই থেকে গেল। ফলে কংগ্রেসের মধ্যেই একসময় এই প্রশ্ন উঠে গেল যে, এখানে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের কোনো গুরুত্ব নেই। দক্ষিণ ভারতে একে কেন্দ্র করেই শ্রী পেরিয়ার কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে দলিতদের জন্য পৃথক সংগঠন গড়ে তোলেন। গড়ে ওঠে সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন। ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজীর মতো কিছু নেতা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বললেও স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতপাত-ধর্মবর্ণের বিভেদ থেকে যাওয়ায় এই অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করা যায় নি। ফলে অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষকে সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসার সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায়।

তাই স্বাধীনতার পর তপশীলি জাতি ও উপজাতির অংশের মানুষকে সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রশ্নটি নতুন করে উঠেছিল। সংবিধান প্রণেতারা তাদের অবস্থার উন্নতিবিধান করবার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেই ১০ বছর সময়সীমা পর্যন্ত শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অনেক মানুষই সেদিন এই সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সাথে সাথে একথাও সেদিন উঠেছিল যে, এই সংরক্ষণই সব নয়, আসলে এই সমস্ত গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের জীবনকে উন্নত করে এমন একটা স্তরে নিয়ে যেতে হবে যাতে তাদের অসহায় অবস্থার অবসান ঘটে এবং শিক্ষা ও চাকরি সহ জীবনের অন্যান্য কোনো ক্ষেত্রেই এই সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা না দেয়। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় ছয় দশক অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি। বরং যত দিন গেছে, ততই নির্মম পুঁজিবাদী শোষণে নিষ্পেষিত এই অংশের মানুষের জীবনের অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। কোনো সরকারই এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর জীবনের সামগ্রিক উন্নতির জন্য কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি, কেবল সংরক্ষণের সময়সীমা ও পরিধি বাড়িয়েছে।

৫৬ বছর ধরে চালু সংরক্ষণ পশ্চাদপদদের কতটুকু কল্যাণ করেছে?

শিক্ষার প্রশ্নে ৫৬ বছর ধরে সংরক্ষণ চলার পরও পরিস্থিতির কি খুব উন্নতি ঘটেছে? উচ্চশিক্ষা দূরে থাক, শুধুমাত্র লিখতে পড়তে পারে এমন তফশীলি জাতি ও উপজাতি মানুষের সংখ্যা যথাক্রমে ২১.৩৮ শতাংশ এবং ১৬.৩৫ শতাংশ। দেশে যত গ্রাম বা মহল্লা আজও স্কুলবিহীন অবস্থায় রয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগেই এই সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বসবাস। যারা স্কুলে কোনোরকমে ভর্তিও হয়, তাদের বেশিরভাগই পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এর আসল কারণ সীমাহীন দারিদ্র্য। অন্নহীন, বস্ত্রহীন অবস্থায় খোলা আকাশের নিচে, পথের ধারে, খালপাড়ে ঝুপড়ি বানিয়েই এই সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষ, কখনও বা যাযাবরবৃত্তি করে, কখনও বা নানান বিচিত্র উপায়ে জীবনযাপন করে থাকেন। এই অবস্থার প্রতিকার না করে এদের শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনা সম্ভব কী? স্বাধীনতা উত্তরকালে কোনদিনই কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন কোনো সরকারই এই মূল প্রশ্নে দৃষ্টিপাত করেনি। এই আর্থিক দুরবস্থার জন্যই এই অংশের ছেলেমেয়েরা মেধার বিকাশ ঘটাবার কোনো সুযোগই পায়নি, তাদের সুযোগ দেওয়াই হয়নি।

২৫ মার্চ এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস-এর মিছিলের পুরোভাগে ডাক্তাররা

তাই অবস্থা এমন যে, এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জন্য যে ২২.৫ শতাংশ আসন চাকুরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে তাতেও লোক নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। বহু পদই খালি থাকছে। ১৯৮৮ সালের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরে তপশীলি জাতির জন্য ১৫ শতাংশ চাকরির মধ্যে মাত্র ১৩.৮৮ শতাংশ এবং তপশীলি উপজাতির জন্য ৭.৫ শতাংশ চাকরির মধ্যে মাত্র ৩.৭৪ শতাংশ পদ পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে এই হার তপশীলি জাতির ক্ষেত্রে মাত্র ৪.৫৭ শতাংশ ও তপশীলি উপজাতির ক্ষেত্রে মাত্র ১.৬২ শতাংশ। অন্যান্য সংস্থার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। শিক্ষাক্ষেত্রেও আমরা একই ছবি দেখতে পাচ্ছি। এলিয়া পেরুমল কমিটির প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ২২টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ২৭২৪টি আসনের মধ্যে ৭১০টি তপশীলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত। এর মধ্যে মাত্র ২২৬টি আসন পূরণ হয়েছে। মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিক্যাল কলেজে তপশীলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত ১৭ থেকে ১৩ শতাংশ আসনের মধ্যে যথাক্রমে ১২ এবং ৪ শতাংশ আসন পূরণ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে তপশীলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত মোট ৫০টি আসনের মধ্যে গত বছর মাত্র ১৭টি আসন পূরণ হয়েছে। যে শিক্ষার প্রসার ঘটালে এই পদগুলি পূরণ করার মতো জনশক্তি এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে পাওয়া যেত, স্বাধীনতার এত বছর পরও কেন্দ্র বা রাজ্য কোনো সরকারই সেটুকু উদ্যোগ গ্রহণ করেনি, পুরো সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নতি তো দূরের কথা। সংরক্ষণের বিষয়টিকে সরকারগুলি কেবল তাদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ভোটে ফায়দা লোটার কাজেই ব্যবহার করে চলেছে। তাই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষদের গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে যে, কেবলমাত্র সংরক্ষণ করার দ্বারা তাদের নির্যাতিত অবস্থার অবসান বা সত্যিকারের সুরাহা কিছু ঘটছে কি! যদি আরো বেশি শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও থাকে, তার দ্বারাও কি এই কাজ সাধিত হবে? সকলেই জানেন, বিহারের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় মানুষ দারিদ্র্যের ও বঞ্চনার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি তুলেছিলেন, শেষপর্যন্ত পৃথক রাজ্যও হয়েছে। কিন্তু হয়েছে নাকি তাদের দারিদ্র্য ও বঞ্চনার অবসান? শুধু সরকারি দলের রঙ বদলেছে, শোষণ বঞ্চনা দূর হয়নি। আবার, অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত একদল ধুরন্ধর রাজনীতিক, আর্থিক দিক থেকেও যাদের অনেকেই প্রতিপত্তিশালী, তারা আওয়াজ তুলেছে যে, অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের নেতৃত্বে পৃথক দলই একমাত্র অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জনগণের স্বার্থরক্ষা করতে পারে। এজন্য বহুজন সমাজপার্টি তৈরি হয় এবং তারা উত্তরপ্রদেশে সরকারেও বসেছিল। কিন্তু তার দ্বারা দলিত বা অনগ্রসর অংশের জনগণের জীবনে কোনও কল্যাণ ঘটেছে কি?

শিক্ষা ও চাকরি পাওয়া প্রতিটি নাগরিকের ন্যায্য অধিকার

অথচ সরকার দেখাতে চায়, যেন সংরক্ষণের দ্বারাই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জীবনে জ্বালা যন্ত্রণা কমবে অনেকখানি। অথচ বাস্তবে আমরা কী দেখছি? এর ফলে একদিকে যেমন যতটুকু সুযোগসুবিধা রয়েছে তার থেকে বেশিরভাগ মানুষ বঞ্চিত হয় এবং একদল মুষ্টিমেয় অপেক্ষাকৃত ধনী মানুষ সেই সুযোগসুবিধা পায়, তেমনি অপরদিকে সমস্ত মানুষের উন্নতি বিধানের মর্যাদাপূর্ণ দাবি, এই সুযোগসুবিধা দেওয়া-নেওয়ার চোরাবালিতে চাপা পড়ে যায়। কোনও সম্প্রদায়ের কোনও মানুষই তো কারুর করুণার পাত্র নন। কিন্তু সরকারের ভাবখানা এমন, যেন সংরক্ষণ রেখে তারা করুণা করছে। সিপিএম, বিজেপি, তৃণমূল সহ সমস্ত বিরোধী দলগুলোও একে সমর্থন করছে।

এই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কি স্পর্ধা যে তারা দেশের কোনো এক সম্প্রদায়ের মানুষকে করুণা করে! শিক্ষা ও চাকরি পাওয়ার অধিকার তো এদেশের প্রতিটি মানুষের ন্যায্য অধিকার। স্বাধীনতার পর এই অধিকারকে সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি কোনোদিন কোনো সরকারই দেয়নি। তা না দিতে পারাটা সরকারেরই ব্যর্থতা। সরকার যদি তা না দিতে পারে, সাধারণ মানুষকেই সংগ্রামের পথে সেই অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুদীর্ঘ দিন ধরে যে বঞ্চনা চলছে তার নিরসন করে সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনে মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসাবে নিজেদের শিক্ষার, কাজের ও বাঁচার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই উপলব্ধিকে নস্যাৎ করে সরকারি দলগুলো সুবিধাবাদের গোলকধাঁধায় মানুষকে আচ্ছন্ন করতে চায়। মাঝে মাঝে সংরক্ষণের ইস্যু খুঁচিয়ে তুলে পুঁজিবাদী শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। সমস্যার মূল কারণ থেকে মানুষের দৃষ্টিকে সরিয়ে দিতে চায়। শাসকশ্রেণীর এই চক্রান্তকে ঠিক ঠিকভাবে না বুঝতে পারলে ওদের পাতা ফাঁদেই পা দেওয়া হবে এবং তা হবে বাস্তবে আত্মহননেরই সামিল।

তিনের পাতায় দেখুন

সংরক্ষণ নিয়ে মোহ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন

একের পাতার পর

গরিব মানুষের মধ্য থেকেও সরকার বশংবদ বানাতে চায়

গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছে যে, সরকারি সংরক্ষণ নীতির দ্বারা এই সমস্ত সম্প্রদায়ের একটা সামান্যতম অংশই মাত্র উপকৃত হয়েছে, বেশিরভাগ অনুন্নত মানুষের জীবনে তার বিন্দুমাত্র প্রভাব বর্তায়নি। তেমনি আজও উচ্চশিক্ষায় ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ নীতি কার্যকরী হলে তার দ্বারা এই সমস্ত জনগোষ্ঠী থেকে হয়ত কিছু সরকারি চাকুরিজীবি, কেরানি, এমনকী কিছু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইপিএস, আইএএস অফিসার তৈরি হবে — কিন্তু এই সমস্ত জনগোষ্ঠীসমূহের বৃহত্তর অংশের মানুষের সমস্যার কেশাগ্রও স্পর্শ করা যাবে না। আর এই সমস্ত সুবিধাভোগী মানুষদের সরকার তার বশংবদ হিসাবে তৈরি করে গরিব ও নিম্নবিত্ত মানুষদের শোষণ করার কাজেই লাগাবে। সমস্ত সময়েই শোষকরা নিপীড়িত মানুষদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে সুযোগসুবিধা দিয়ে দলে টেনে বৃহত্তর জনসংখ্যার উপর শোষণ চালায়। ব্যক্তি বিশেষে কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও আমাদের দেশেও এ জিনিস বার বার ঘটে আসছে। সিপিএম সমর্থিত ও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও সেই উদ্দেশ্যেই গরিব মানুষকে শোষণ করার জন্য গরিব মানুষের মধ্য থেকেই কিছু মানুষকে বশংবদ বানাতে চাইছে। এর দ্বারা সামগ্রিকভাবে সত্যিই যারা পশ্চাদপদ তাদের অগ্রগতি ঘটবে কি?

আবার একথাও সত্য যে, যারা সংরক্ষণের সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন, তারাও জাতপাতের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন কি? হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা সামাজিক প্রথা ও জাতিভেদের মানসিকতা মানুষের মনের গভীরে বাসা বেঁধে আছে। তথাকথিত উচ্চবর্ণের মধ্যে মিথ্যা মর্যাদাবোধ আর অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে হীনমন্যতার এই যে অবস্থিতি, এ কেবল উচ্চশিক্ষা, চাকরি বা অন্যান্য সুযোগসুবিধা দানের মধ্য দিয়ে সমাধান হতে পারে না। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুকাল আগেই দেখিয়েছিলেন যে, যতদিন না সামাজিক দিক থেকে ছোঁয়াছুঁয়ির মতো অসম্মানজনক বিভেদ ব্যবস্থা প্রভৃতির অবসান ঘটিয়ে সমস্ত ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক, আত্মীয়তার বন্ধন ইত্যাদি গড়ে না উঠবে ততদিন পারস্পরিক বিভেদের চীনের প্রাচীর লুপ্ত হবে না। একটা দীর্ঘ সামাজিক সচেতন সংগ্রামের ফলশ্রুতিতেই এটা সম্ভব। এবং এর জন্য গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন সমস্ত ছাত্র-যুব ও শিক্ষিত জনসাধারণের সক্রিয় উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শর্ত। এ সংগ্রাম গড়ে তুলতে গেলে সমস্যার গভীর ঢুকতে হবে, জানতে হবে। আজকের এই সামাজিক সমস্যা, আমাদের জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা, সমস্ত কিছুরই যে মূল কারণ তাকে অনুসন্ধান করতে হবে। আমরা যদি সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত না করে কেবল প্রলেপ লেপন করতে থাকি তাহলে ক্ষত সাময়িকভাবে চাপা পড়লেও ভেতরের দগদগে ঘা থেকেই যাবে, এবং সুযোগসন্ধানীরা প্রয়োজনমত তাকে ব্যবহার করে মূল সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টি শুধু অন্যদিকে সরিয়ে দেবে না, জনগণের ঐক্য ভেঙ্গে দিয়ে মূল শত্রুর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে দুর্বল করে দেবে — যেমন আজকে আমরা তার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাচ্ছি।

তথাকথিত উচ্চবর্ণ গোষ্ঠীর অনেক ছাত্রছাত্রী আজ তাদের জীবনে রোজগার বা চাকরির সুযোগ নেই বলে বাস্তবে যা দেখছেন, তার কারণ কি সংরক্ষণ? এই কয়েকটি আসন যদি সংরক্ষিত নাও থাকত, তাহলেও কি উচ্চশিক্ষায় সুযোগ পাওয়ার সমস্যা থাকত না? তাছাড়া তপশীলি জাতি ও উপজাতির জন্য যতটুকু সংরক্ষণ এতদিন ছিল তারই বহু আসন তো শূন্য পড়ে রয়েছে। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে তথাকথিত উচ্চবর্ণের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার পথে তারাই বাধা, এ কেমন করে সম্ভব? বর্ণ-বিভেদের প্রশ্নকে বাদ দিয়ে যদি দেখা যেত, যে উচ্চশিক্ষা বা চাকরির সুযোগ যতটা হচ্ছে তার বেশিরভাগই চলে যাচ্ছে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য, তাহলে না হয় কথাটা ভাবা যেতে পারত। কিন্তু এখানে তো পরিস্থিতি তা নয়। তাছাড়া এই কথা তো সত্য, যে শিক্ষার জন্য সংরক্ষণ ঘোষণা করা হচ্ছে সেই শিক্ষার সুযোগই তো ক্রমাগত কমছে। সরকার জনসংখ্যার এক একটা অনুপাত দেখিয়ে তাদের জন্য বেশ কিছু শতাংশ করে আসন সংরক্ষিত করে দিচ্ছে। কিন্তু যে কারণে শতাংশের হিসাবে আসন সংরক্ষণ করা হচ্ছে সেটিই তো একটি বিরাট শূন্য। তার ১ শতাংশ ও ১০০ শতাংশ সবই তো সমান। যেকোন সম্প্রদায়ের মানুষই হন না কেন, তিনি বা তারা বড়জোর শতাংশের হিসাব নিয়ে বসে থাকতে পারেন, কিন্তু উচ্চশিক্ষার সুযোগ যে অত্যন্ত সীমিত এতো জ্বলন্ত সত্য। এটাই তো আসল সমস্যা। এর জন্য বিশেষ কোনো সম্প্রদায় কি দায়ী? না কি দায়ী সরকার, সরকারি নীতি ও সর্বোপরি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা?

সংরক্ষণ নয়, পুঁজিবাদী শোষণ বঞ্চনা ও বৈষম্যনীতিই সমাজকে পঙ্গু করে দিচ্ছে

প্রসঙ্গত, সংরক্ষণবিরোধী ছাত্র-যুব ও বুদ্ধিজীবীদের একথাও বোঝা দরকার যে, আমাদের দেশের বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক কারণে, যেসমস্ত গোষ্ঠীর মানুষ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথার্থই পিছিয়ে রয়েছে, তাদের যদি আমরা প্রয়োজনীয় বিকাশের সুযোগ দিয়ে এগিয়ে থাকা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সমান স্তরে উন্নীত করতে না পারি, অর্থাৎ চিরকালই যদি আমাদের দেশের শোষিত-নিপীড়িত মানুষ উচ্চ ও নিম্নবর্ণের আড়ালে অগ্রসর ও অনগ্রসর — এরকম দুই অংশে বিভক্ত থাকে, তাহলে কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা নিম্নবর্ণভুক্ত মানুষের মানসিক হীনমন্যতাকে প্ররোচিত করে চিরকালই সংরক্ষণের পক্ষে ও বিপক্ষে শোষিত মেহনতী মানুষকে আত্মঘাতী সংঘাতে লিপ্ত করানোর সুযোগ পাবে। এর ফলে যে পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা উচ্চ ও নিম্ন সকল বর্ণের মানুষের মানবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে, তার বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষ কোনদিনই ব্যাপকতম ঐক্যের ভিত্তিতে দুর্বার বিপ্লবী আন্দোলনের জন্ম দিতে পারবে না। বরং সে আন্দোলনকেই আমরা এর দ্বারা খণ্ডিত, দুর্বল ও বিপথগামী করব। উচ্চবর্ণভুক্ত হবার সুবাদে যারা আপেক্ষিক অর্থে অগ্রসর, সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে এই দিকটির প্রতি তাদেরই বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে এবং মানবিক সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের বিকাশের কথা ভাবতে হবে।

অথচ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে, সংরক্ষণবিরোধী ছাত্রবিক্ষোভের অভিমুখ কোথাও কোথাও অনগ্রসর শ্রেণীর বিরুদ্ধেই চলে যাচ্ছে, জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণার প্রকাশ ঘটছে। এই অংশের মানুষের, ছাত্রছাত্রীদের মেধা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, এমনকী এদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে দেখার মানসিকতা ফুটে উঠছে সংরক্ষণবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের প্রচারপত্রের প্রতিটি ছত্রে।

মেধা জন্মগত নয়

সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলনে সামিল একদল মনে করছেন যে, সংরক্ষণের ফলে শিক্ষার মানের অবনমন হবে। কিন্তু মেধা কি জন্মগত? নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের মধ্য দিয়েই তো মেধার বিকাশ হয়। শিশুবয়স থেকে শিক্ষা ও অনুশীলনের এই সুযোগ কি অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষ পায়? তার দায়িত্ব কার? আবার একথাও তো সত্য যে, এই অংশের মানুষের মধ্যে যাঁরা মেধা বিকাশের সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছেন। তাই মেধার প্রশ্নে যদি তাঁরা সত্যিই চিন্তিত হন, তাহলে এই অংশের মানুষের মেধা বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তো তাঁদেরই তোলা উচিত। আবার সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে যারা ভর্তি হচ্ছে, তাদেরও জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় একটা ন্যূনতম নম্বর পেতে হচ্ছে। পড়াশেষে চূড়ান্ত পরীক্ষাতেও অন্যদের মতো প্রয়োজনীয় নম্বর পেয়েই উত্তীর্ণ হতে হচ্ছে। ফলে, তাদের ক্ষেত্রে মেধার কোনো বিচার হচ্ছে না — একথা বলা কি যুক্তিসঙ্গত? তবে লক্ষ্য করার বিষয় হল, সংরক্ষণের প্রশ্নে যাঁরা মেধার প্রশ্ন তুলছেন, তাঁরা এন আর আই কোটা বা ক্যাপিটেশন ফির বিরুদ্ধে একটা শব্দও খরচ করছেন না। গত বছর ডিসেম্বর মাসে সংসদে 'দি প্রাইভেট প্রফেশনাল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন' (রেগুলেশন অফ এডমিশন অ্যান্ড ফিক্সেশন অফ ফিস্) বিল পাশ হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে প্রাইভেট কলেজে ৫০ শতাংশ ম্যানেজমেন্ট কোটা এবং ১৫ শতাংশ এন আর আই কোটা থাকবে। এইসব আসনে ভর্তির জন্য কর্তৃপক্ষ আলাদা পরীক্ষা নিতে পারবে। মহারাষ্ট্রে দেখা গেছে, এ ধরনের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় যে প্রথম হয়েছে, সরকারি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সে ৩৫ স্থান পেয়েছে এবং যে দ্বিতীয় হয়েছে, সে সরকারি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় হয়েছে ৪১৩। পশ্চিমবঙ্গেও গত বছর মেডিক্যালে যারা ৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকার বিনিময়ে এন আর আই কোটায় ভর্তি হয়েছে, তারা কেউ জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পরীক্ষা দিয়ে আসেনি। মেধা নিয়ে যারা এত চিন্তিত তারা কতজন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন? তাহলে কী ধরে নিতে হবে যে মেধা ও টাকা সমার্থক?

ঘৃণ্য ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি

সংরক্ষণবিরোধী ও সংরক্ষণপন্থী উভয় অংশের ছাত্রছাত্রীদের আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, নয়ের দশকের গোড়ায় ভিপি সিংয়ের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের মোর্চা সরকার মণ্ডল কমিশনের বকলমে কর্মক্ষেত্রে ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দেশব্যাপী ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। সেদিনও এই ঘোষণার আসল উদ্দেশ্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য কাজের সুযোগ সুনিশ্চিত করা ছিল না। সেসময় বিজেপি রামরথযাত্রার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে বর্ণহিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরির যে হীন পরিকল্পনায় নেমেছিল, পাল্টা হিসাবে জনতা দল ও অন্যান্যদের জন্য দলিত ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করাই ছিল ভিপি সিং ও তার সহযোগীদের মতলব। এই খেলার পরিণামে দেশে বর্ণবিদ্বেষের আগুন জ্বলেছিল। আজও যখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির তীব্র জনবিরোধী নীতি অনুসরণের ফলে হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী, ছাঁটাই হচ্ছে, লাফিয়ে লাফিয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে চাষীরা আত্মহত্যা করছে, বেকারে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে, তখন কংগ্রেস ও তার সহযোগীরা ভোটের বাজারে এই জাতপাতের দ্বন্দ্বকেই বাজি করতে চাইছে। সামনেই উত্তরপ্রদেশ সহ কয়েকটি প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন, সর্বোপরি ২ বছর পরেই লোকসভা নির্বাচন। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের অবস্থা ভাল নয়। ২ বছরের শাসন জনগণকে কিছুই দেয়নি, আগামী ২ বছরেও কিছু দেবেনা। বরং কেড়ে নেবে অনেক কিছু।

অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের সরকারি দল সমাজবাদী পার্টির মুলায়ম সিং সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করেছেন, মায়াবতী তৈরি করেছেন দলিত ভোটব্যাঙ্ক। বিজেপির পক্ষে রয়েছে উচ্চবর্ণের ভোট। এই অবস্থার জন্যই কংগ্রেস উচ্চশিক্ষায় নতুন সংরক্ষণ চালু করে নিজস্ব ওবিসি ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে নেমেছে। বিজেপি ও মেকি বামপন্থী দলগুলিও এই ঘৃণ্য ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির কারবারী। সেজন্যই ওবিসি'র জন্য সংরক্ষণ করতে গিয়ে যাতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের ভোট হাতছাড়া না হয়ে যায়, তাই দু-নৌকায় পা দিয়ে চলার হীন কৌশল নিয়েছে এরা। যেমন সিপিএমের পলিটব্যুরো দিল্লিতে বিবৃতি দিয়ে সংরক্ষণের সরকারি সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছে, অথচ ঐ পলিটব্যুরোরই আর এক সদস্য, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু পশ্চিমবঙ্গে সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলনকারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে চলেছেন। বিজেপি নেতা অরুণ জেটলি সংরক্ষণ প্রশ্নে তাঁর দল সরকারের পাশেই আছে বলে বিবৃতি দিচ্ছেন, আবার ঐ দলেরই অপর দুই নেতা বিজয় মালহোত্র ও সুষমা স্বরাজ সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলনরত ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই হচ্ছে এদের চরিত্র!

সংরক্ষণপন্থী ও সংরক্ষণবিরোধী উভয় অংশের ছাত্রছাত্রীদের ভেবে দেখতে হবে যে, আজকের সমস্যাটা কি সত্যই সংরক্ষণের? শিক্ষা যেখানে পণ্যে পরিণত সেখানে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর জন্যই তো বাস্তবে তা সংরক্ষিত হচ্ছে। আমাদের দেশটা যে ধনী ও গরিবে বিভক্ত হয়ে আছে, স্বাধীনতার পর মুষ্টিমেয় মালিক পুঁজিপতিদের মুনাফার পাহাড় তৈরি হয়েছে, আর দেশের বেশিরভাগ মানুষ বেকারি ও গরিবির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, সে কী সংরক্ষণের জন্য? বেকার সমস্যা কি সংরক্ষণের জন্য? এর জন্য তো দায়ী পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, যাকে ভাঙতে না পারলে সকলের জন্য চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কখনই পাওয়া যাবে না। এই মূল সত্যকেই তো পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের তল্পিবাহক সরকার ও ভোটবাজ দলগুলো ছাত্র ও যুবসমাজের কাছ থেকে আড়াল করতে চায়। ছাত্র ও যুবসমাজ যাতে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে, সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার মতো দুর্বার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল না হতে পারে, সেজন্যই সংরক্ষণের ইস্যু তুলে এক অংশের মধ্যে মোহ, অপর অংশের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে লিপ্ত করে দিতে চায়। শিক্ষার সুযোগ পাওয়া ছাত্রসমাজ যদি এই রাজনৈতিক মতলবকে ধরতে না পারে, তবে ধরবে কারা? কখনও হিন্দু-মুসলিম, কখনও উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় যদি এভাবে আত্মহনন চলতে থাকে, তবে তো শোষকশ্রেণীরই লাভ, ধুরন্ধর রাজনীতিকদেরই স্বার্থসিদ্ধি হয়।

সকল শোষিত মানুষ যদি বর্ণবিদ্বেষের প্রাচীর ভেঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না হয়, তাহলে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হবে কী করে? তাই আজ ঐক্যবদ্ধ শক্তিই প্রয়োজন। আজ সংরক্ষণবিরোধী বা সংরক্ষণপন্থী — এই আন্দোলন নয়, এই বিভাগ নয়, চাই সকলের জন্য শিক্ষা, সকলের জন্য কাজ। সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত হলে সংরক্ষণ থাকা না থাকার প্রশ্নটি মূল্যহীন হয়ে যায়। এদেশের প্রকৃত বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও তার জন্মলগ্ন থেকেই শিক্ষা সংকোচনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে। শিক্ষাকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করার ব্লু-প্রিন্ট হিসাবে যখন জাতীয় শিক্ষানীতি '৮৬ চালু হয়, তার বিরুদ্ধে একমাত্র এ আই ডি এস ও

পাঁচের পাতায় দেখুন

ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি সাম্রাজ্যবাদী জোট ছাড়া কিছু নয়

(গত সংখ্যার পর)

বিশ্বরাজনীতিতে ই ই সি বা পরবর্তীকালে ই ইউ-এর মতো ঘটনাবহুল এবং প্রবল প্রভাবশালী কোনও সংগঠনের গুরুত্ব ঠিকমতো বিচার করতে হলে আমাদের অবশ্যই তার আগে ইউরোপ মহাদেশের ইতিহাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। তবে তারও আগে আমরা সর্বহারার মহান নেতা লেনিনের এই বিষয়ে কিছু শিক্ষা স্মরণ করব। সেই ১৯১৫ সালে যখন সারা ইউরোপ জুড়ে চলছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব আর সমগ্র পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া প্রবল সঙ্কটে হাবুডুবু খেতে খেতে খুঁজে চলেছে তা থেকে পরিত্রাণের উপায়, তখন লেনিন 'সোৎসিয়াল দেমোক্র্যাৎ' পত্রিকায় লিখেছিলেন, ''পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হলে, তা হবে বোঝাপড়ার মাধ্যমে উপনিবেশগুলিকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার সামিল। পুঁজিবাদে পেশীশক্তি ছাড়া ভাগাভাগির অন্য কোনও ভিত্তি, অন্য কোনও নীতি থাকতে পারে না। এই দিক থেকে বিচার করলে ইউরোপের পুঁজিপতিদের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতেই কেবল ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্ভব — কিন্তু কী লক্ষ্যে? তার একমাত্র লক্ষ্য হবে ইউরোপে সমাজতন্ত্রকে দমন করা, জাপান ও আমেরিকার গ্রাস থেকে ইউরোপের ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনকে রক্ষা করা। সাম্যবাদের চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের, এমনকী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপ হওয়ার আগে সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে আমরা যে জাতিগুলির সম্মিলন ও স্বাধীনতার কথা বলি, সেটা কেবল ইউরোপের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্ব নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র।'' লেনিন একথাও স্পষ্টভাবে বলেন যে, ''সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে জড়িত করে কোন আঁতাত গড়ে উঠলে সেটা অনিবার্যভাবেই দু'টি যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের একটি 'বোঝাপড়া' ছাড়া কিছু হতে পারে না। শান্তির আঁতাত যুদ্ধের জমিই তৈরি করে, আবার যুদ্ধ থেকেই শান্তির আঁতাত জন্ম নেয়, একটার সাথেই অপরটা জড়িয়ে থাকে। বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতির অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যকার যে সংযোগ ও সম্পর্ক তাকে ভিত্তি করেই কখনও শান্তিপূর্ণ লড়াই, কখনও সংঘর্ষমূলক লড়াই জন্ম নেয়।''

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এইসব অমূল্য শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং এ যুগের অন্যতম অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে আমরা এই বিষয়ে সেই ১৯৬১ সালেই গণদাবী পত্রিকায় একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। প্রবন্ধটি ১৯৬১ সালের ৩১ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে আমরা ই ই সি-র উদ্ভব এবং বিশ্বরাজনীতিতে সে কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে চলেছে সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছিলাম। বিশ্লেষণের মাধ্যমে আজ থেকে ৪৫ বছর আগে লেখা সেই প্রবন্ধেই আমরা দেখিয়েছিলাম যে, বহু আলোচিত এই ই ই সি বাস্তবে দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শান্তিপূর্ণ জোটগঠনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে খানিকটা প্রশমিত করে তখন তখনই বিধ্বংসী যুদ্ধ এড়ানোর এক প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এক বিধ্বংসী যুদ্ধ থেকেই এর উদ্ভব এবং নিজেদের মধ্যে অনিরসনীয় দ্বন্দ্বের পরিণতিতে সে আরেক যুদ্ধেরই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে চলেছে। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ মহাদেশের ইতিহাসে এরকম উদাহরণ আরও আছে।

শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী যুগে ঐ বিপ্লবের ফল হিসাবেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দ্রুত একচেটিয়া পুঁজি গড়ে উঠতে থাকে এবং কিছুদিনের মধ্যেই এই দেশগুলি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয় যারা সারা পৃথিবীর বাজারের উপর তাদের শাসনক্ষমতা জারি করতে শুরু করে। অবশ্য এই সমগ্র ব্যাপারটি ঘটতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয় এবং নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে তা এই পর্যায়ে উপনীত হয়। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়টি ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবাধ বিকাশের সময়। এই সময় পুঁজিবাদ জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় গণ্ডির মধ্যে অবাধ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশেরই পক্ষে ছিল। নিজের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্রুত ও বাধাহীন বিকাশের স্বার্থেই তখন তাদের এই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রয়োজন ছিল। কারণ বাইরের শক্তির অধীনে থেকে তাদের পক্ষে তখন এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু শোষণমূলক অর্থনীতিতে পুঁজির শক্তি যতই বৃদ্ধি পেতে থাকল, ততই বাজার ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে শুরু করল ও তারই ফলশ্রুতিতে দেখা দিতে শুরু করল প্রবল সঙ্কট। তাদের অন্তর্দেশীয় বাজার তাদের পক্ষে ক্রমশ যতই সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে শুরু করল, মুক্তবাণিজ্য অর্থনীতির অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ ছেড়ে পুঁজির মধ্যে ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা ততই বাড়তে থাকল। জন্ম নিল একচেটিয়া পুঁজি। ফলে যে বুর্জোয়ারা এককালে ছিল জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সার্বভৌমত্বের প্রবক্তা, তারাই ক্রমশ জাতীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে পুঁজি রপ্তানি শুরু করল। পুঁজিবাদী শোষণ টপকে গেল নিছক জাতীয়তার গণ্ডি ; বাইরের কাঁচামাল ও শ্রমের বাজার দখল করাই হয়ে উঠতে শুরু করল তার লক্ষ্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আবির্ভাব ঘটল সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের। ক্রমশ তারা হাত বাড়াতে শুরু করল অপর দেশের সার্বভৌমত্বের দিকে, তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করে শুরু হল তাদের উপনিবেশ সাম্রাজ্যের বিস্তার। এই নতুন নতুন উপনিবেশ দখল ও নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকার বিস্তার অনিবার্যভাবে কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে। আরও নতুন উপনিবেশ, প্রভাবাধীন এলাকা ও তাদের বাজার দখল ও তাকে সংহত করার লক্ষ্যে শুরু হয়ে গেল সংঘাত, যা খুব স্বাভাবিকভাবেই ডেকে নিয়ে এল যুদ্ধকে। আবার একটা বিধ্বংসী যুদ্ধের পর যখন খানিকটা দম ফেলার ফুরসতের প্রয়োজন, তখন দেখা গেল তারাই আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে শান্তির পতাকা হাতে। আসলে তখন তাদের নিজেদের মধ্যে আপসে বাজার ভাগ করে নিয়ে সাময়িকভাবে সংঘাত এড়িয়ে চলার সময় শক্তিক্ষয় না করে তাদের প্রয়োজন পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে নেওয়ার।

এই প্রসঙ্গে লেনিনের বিখ্যাত রচনা 'সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' বইটি থেকে আরেকটি অমূল্য শিক্ষা আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন। সেখানে আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রিটেনের উদাহরণ টেনে তিনি বলেছিলেন, ''১৮৪০ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে যখন গ্রেট ব্রিটেনে অবাধ প্রতিযোগিতার অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল সে সময় ব্রিটেনের প্রথম সারির বুর্জোয়া রাজনীতিকরা ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে ছিল, এবং তাদের অভিমত ছিল, উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা, ব্রিটেন থেকে তাদের সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়।... কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে বুর্জোয়া রাজনীতিকরা সেইসময় ব্রিটিশ গৌরবের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, তারা খোলাখুলি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ওকালতি করে। কার্যক্ষেত্রেও অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুসরণ করে।'' সাম্রাজ্যবাদের যুগে লগ্নি পুঁজির বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেনিন দেখান ''সকল অর্থনৈতিক ও সকল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে লগ্নি পুঁজি এমনই বিরাট, এমনই এক অমোঘ শক্তি যে, তা এমনকী পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগকারী রাষ্ট্রগুলিকেও নিজের অধীনস্থ করতে পারে এবং বাস্তবে তা করেও। ...অবশ্যই লগ্নি পুঁজি সেই ধরনের অধীনতাকেই সবচেয়ে 'সুবিধাজনক' মনে করে এবং লাভও করে সেক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি, যেসব ক্ষেত্রে অধীনতার দ্বারা অধীনস্থ দেশগুলির ও জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করা যায়।'' এদিক থেকেই ''একচেটিয়া পুঁজি, ধনকুবের গোষ্ঠী, স্বাধীনতার জন্য নয়, আধিপত্য বিস্তারের জন্য মরিয়া চেষ্টা, সবচেয়ে ধনী বা সবচেয়ে শক্তিমান মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক ক্রমাগত বেশি সংখ্যায় ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে শোষণ — এইসব কিছু সাম্রাজ্যবাদের এমন কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যেরও জন্ম দিয়েছে যা সাম্রাজ্যবাদকে পরজীবী বা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ হিসাবে বর্ণনা করতে আমাদের বাধ্য করছে।'' এই পরিস্থিতির ফলাফলগুলিকেও লেনিন দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদ বিকাশের পথে বর্তমান স্তরকে নিয়ে যে যুগ, সেটা আমাদের দেখাচ্ছে যে, বিশ্বকে অর্থনৈতিকভাবে ভাগাভাগি করে নেওয়ার ভিত্তিতে পুঁজিবাদী জোটগুলির (association) মধ্যে কিছু সম্পর্ক গড়ে ওঠে; এরই সাথে সম্পর্কিত হয়ে ও সমান্তরালভাবে রাজনৈতিক জোটগুলির পরস্পরের মধ্যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কিছু সম্পর্ক তৈরি হয় যার ভিত্তিমূলে থাকে বিশ্বের ভূখণ্ডের ভাগাভাগি, উপনিবেশ দখলের জন্য সংঘর্ষ, প্রভাবাধীন অঞ্চল তৈরির জন্য লড়াই। ...অতএব, এবিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না যে, বিশ্বকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে পুঁজিবাদের একচেটিয়া পুঁজিতে, লগ্নি পুঁজিতে রূপান্তর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

ঠিক এইভাবেই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যা স্বাভাবিক পরিণতি, সেই প্রবল বাজার সঙ্কট, সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বেই বিশ্বকে ঠেলে দিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবর্তে। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই জড়িয়ে পড়ল সেই বাজার দখলের যুদ্ধে। প্রত্যেকেই যুযুধান দুই পক্ষের কোনও না কোনও দিকে যোগ দিল এবং বিশ্ববাজারে নিজ নিজ আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা করল। কিন্তু যুদ্ধ বাজার-সঙ্কটের লাঘব ঘটাতে পারল না। উল্টে রাশিয়া বেরিয়ে গেল পুঁজিবাদী বাজারের পুরো চৌহদ্দি থেকেই। সেখানে সর্বহারার মহান নেতা লেনিনের নেতৃত্বে ঘটে গেল বিপ্লব, প্রতিষ্ঠিত হল সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অপরদিকে ইউরোপে শান্তির জন্য প্রয়াস হল, যেটা অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার সঙ্কট চলতেই থাকল, বরং উত্তরোত্তর তা আরও বৃদ্ধি পেল। পুঁজিবাদী সঙ্কট কাটাবার দাওয়াই হিসাবে ইতালিতে ফ্যাসিবাদ ও জার্মানিতে নাৎসিবাদের উত্থান ঘটানো হল। কিন্তু তাতে সঙ্কট কেটে ওঠা দূরে থাকুক, বরং তা প্রবলতর আকার ধারণ করে তাড়িয়ে নিয়ে চলল জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা সহ সমগ্র পুঁজিবাদী-সাম্রাজাবাদী দুনিয়াকেই এক প্রবলতর সংঘাতের দিকে। শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। নিরন্তর বাজার খুঁজে চলা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো যুদ্ধ শেষে শান্তির পথে যেতে বাধ্য হল। কিন্তু তাদের বাজার সঙ্কটও তার সাথে বহুগুণ বেড়ে গেল। অপরদিকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবসভ্যতাকে রক্ষার মরণপণ সংগ্রামে জয়লাভ করার মধ্য দিয়ে ততদিনে সমাজতন্ত্র বিশ্বে জোরদার শক্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে। বিশ্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলে গড়ে উঠল নানা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যাদের নিয়ে তৈরি হল সমাজতান্ত্রিক শিবির। অপরদিকে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় বিভিন্ন পূর্বতন উপনিবেশগুলি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে দেখা দিল এবং পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ করল, এবং এর দ্বারা বিশ্ব বাজারে তারা বনেদি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিশ্ববাজারে আত্মপ্রকাশ করল। ফলে বাজার হয়ে পড়ল আরও সঙ্কুচিত। কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় মন্দার সঙ্কট তীব্রতর হয়ে পূর্বেকার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল। এর পরিণামে রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে একের পর এক নানা পরিবর্তন ঘটল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল সাম্রাজবাদীদের আরও বেশি করে বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করল, শক্তির ভারসাম্যেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল।

বিভিন্ন বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় আকাঙ্ক্ষার, আবার তার সাথে একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ ঘটার ফলে তার যে জাতীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে যাওয়ার তাগিদ — এই দুটোকে মিলিয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি চেষ্টা করল নানা ধরনের জোট ও এমনকী দুই বা ততোধিক দেশের একচেটিয়া পুঁজির সংযুক্তির মধ্য দিয়ে শক্তিশালী কসমোপলিটান একচেটিয়া পুঁজি গড়ে তুলতে। লক্ষ্য ছিল, অবশ্যই নিজেদের পুঁজির শক্তিবৃদ্ধির মাধ্যমে সঙ্কট কাটাতে অন্যসব প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দিয়ে বাজারের উপর একমাত্র আধিপত্য কায়েম করা। যেখানে তারা এভাবে সরাসরি নিজেদের শক্তিবৃদ্ধিতে অসমর্থও হল, সেখানেও তারা অন্তত বিশেষ বিশেষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি যৌথ নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে চলবার চেষ্টা করতে লাগল, যাতে সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে চলা যায়। কিন্তু এর ফলে সর্বদা তাদের নিজেদের মধ্যেই এক প্রকার দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই গেল। তা হল, তাদের মধ্যে মূলগতভাবেই বজায় থাকা জাতীয় স্বার্থের সাথে নতুন গড়ে ওঠা বহুজাতিক বা কসমোপলিটান স্বার্থের বিরোধ। প্রথমটির লক্ষ্য যেখানে স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় স্বার্থের ক্রমাগত বিকাশ ও আধিপত্য, দ্বিতীয়টির লক্ষ্য সেখানে দেশ বা জাতি নির্বিশেষে আরো আরো পুঁজির সাথে ঐক্যস্থাপন ও তার মাধ্যমে নিজেদের ক্রমাগত ক্ষমতা বৃদ্ধি।

এর পাশাপাশিই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে শক্তির ভারসাম্যেও ঘটে গেল এক বড় রকমের রদবদল। ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং সেইসাথে হল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং অন্যান্য পুরনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সেইসাথে তারা হারিয়েছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিশাল ঔপনিবেশিক বাজারও। অপরদিকে জার্মানি, ইতালি ও জাপান ছিল পরাজিত ও যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। অন্যদিকে পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থানগত কারণেই এই যুদ্ধে সবথেকে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ চলাকালীন তারা ইউরোপীয় যুদ্ধরত দেশগুলির কাছে দরাজ হাতে অস্ত্র বিক্রির মাধ্যমে মুনাফার পাহাড়ও জমিয়ে ফেলতে পেরেছিল। ফলে যুদ্ধশেষে তারা সহজেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে পিছনে ফেলে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের প্রধান শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করল। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলিও তখন অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে খুবই দুর্বল। সুযোগটি কাজে লাগিয়ে দেশে দেশে তাদের নয়া উপনিবেশবাদী আধিপত্য কায়েম করতে আমেরিকা সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। এজন্য সেসব দেশের প্রশাসনে নাক গলানো, চাপ সৃষ্টি করা বা সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ, কোনও কাজেই তারা পিছপা হল না। পাশাপাশি তারা শুরু করল যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের

ছয়ের পাতায় দেখুন

শেয়ার বাজারে ধস

একের পাতার পর

ভালো তার প্রমাণ হল শেয়ার বাজার চাঙ্গা আছে। গত মাসেও একই কথা সরকার ভাঙা রেকর্ডের মতো বাজিয়েছে। এমনকী শেয়ারসূচক দশ হাজার অঙ্কে পৌঁছানোটাকে ঐতিহাসিক সাফল্যের মতো করে দেখানো হয়েছিল। কোন কোন বাজারবিশেষজ্ঞ তখনই অবশ্য আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, বাজার আসলে ফাটকাবাজির ফলে বুদ্‌বুদের মতো ফুলছে, যেকোন মুহূর্তে তা ফেটে পড়বে। অনেকদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে, নানা কারণে শেয়ার বাজারে দেশি-বিদেশি প্রচুর টাকা ঢুকছে, বিশেষত বিদেশ থেকে লগ্নি পুঁজি ঢুকছে বিপুল পরিমাণে। দেশের অভ্যন্তরেও বিপুল পুঁজি অলস, কলকারখানা, কৃষি প্রভৃতি উৎপাদনী ক্ষেত্রে উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাজার নেই। অথচ শেয়ার বাজারে লাভ মাত্রাছাড়া, প্রায় ২১ শতাংশ। ফলে রিলায়েন্স, টাটার মতো প্রতিষ্ঠানও শেয়ার বাজারে দ্রুত উচ্চহারে মুনাফা তুলতে নেমেছে। উচ্চ মুনাফার হাতছানিতে বিপুল পুঁজি ঢুকছে শেয়ার বাজারে, যার ফলে শেয়ারের চাহিদা বাড়ছে, দাম বাড়ছে।

এদেশে শাসকদলের নেতারা, এমনকী সিপিএম নেতারাও প্রায়ই বলেন, আমাদের দেশে পুঁজি নেই। তাই যদি হবে তাহলে শেয়ার বাজারে এত পুঁজি আসছে কোথা থেকে? আসলে বাজারসঙ্কটের কারণে পুঁজি উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সহজে আসতে চায় না, ফাটকাবাজি করে বা শেয়ার কিনে বেচে দ্রুত উচ্চহারে মুনাফার জন্য উদ্বৃত্ত পুঁজি শেয়ার বাজারের পথ ধরে। এই উদ্বৃত্ত পুঁজির উচ্চ মুনাফার স্বার্থ দেখতে সরকার এত উদগ্রীব যে এমনকী শ্রমিক-কর্মচারীদের অবসরকালীন অবলম্বন প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকাও শেয়ার বাজারে খাটানোর অবিরাম চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু বাজারের চাঙ্গা অবস্থাটা ততদিনই থাকতে পারে যতদিন পুঁজির জোগানটা অব্যাহত থাকে। পুঁজির জোগান ততদিন অব্যাহত থাকে যতদিন সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত থাকে। সেজন্য সরকার যে কাজটা করে তাহল, প্রথমত, ক্রমাগত কর ছাড় দিয়ে বা কর কমিয়ে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করাকে খুবই লোভনীয় করে রাখার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, দেশের বাজারে অন্যান্য আমানতে সুদ কমিয়ে, নিরাপদ সঞ্চয়ের রাস্তা সঙ্কুচিত করে যতটা সম্ভব টাকা শেয়ার বাজারে টানার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত, বেপরোয়া ফাটকা হচ্ছে দেখেও তা আটকাবার চেষ্টা করে না। এ ধরনের সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টাই বুর্জোয়া সরকারগুলি করে থাকে। বিজেপি করেছে, কংগ্রেসও সিপিএমের সমর্থনে তাই-ই করছে।

এছাড়াও, যেহেতু বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় এখন ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্ব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সঙ্গে আগের চেয়ে অনেক বেশি যুক্ত, তাই বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির টানাপোড়েনের উপর বিদেশি পুঁজির এদেশে আগমন অনেকটা নির্ভরশীল। ইদানিংকালে মার্কিন দেশে সঞ্চয়ের উপর সুদের হার খুব কম থাকায়, বিদেশি পুঁজি যতটা ভারতে আসছিল, সম্প্রতি সেদেশে সুদের হার বাড়ায় সেই পুঁজির আসার ক্ষেত্রে ভাটার টান ধরার আশঙ্কা প্রকট হচ্ছিল। এনিয়ে পরে আলোচনা করা হবে। কিন্তু এসব কারণের মধ্যে ঠিক কোন্‌টার জন্য শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে তা নিয়ে বাজার বিশেষজ্ঞরা একমত না হলেও একাধিক ব্যাপারকে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন যেগুলি মিলেমিশে শেয়ার বাজারে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ব্যাঙ্ক পুঁজি ফাটকাবাজদের স্বার্থেই কাজ করে

প্রথমত, ফাটকার রীতি অনুযায়ী বাজার যত চড়ছিল ততই আশু লাভের জন্য বেচা-কেনার মাধ্যমে শেয়ারের হাতবদলের সংখ্যাও বাড়ছিল। শেয়ার বাজারের নিয়মানুযায়ী শেয়ার দালালদের স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে একটা মার্জিন মানি (সাধারণত শেয়ারের দামের ২৫ শতাংশ) জমা রাখতে হয় যেটা তারা শেয়ার ক্রেতার কাছ থেকে নেয়। যত মূল্যের শেয়ার কেনা হচ্ছে তার তুলনায় জমা থাকা মার্জিন মানি কম হয়ে পড়লে স্টক এক্সচেঞ্জ দালালের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তা নিয়ে নেয়। দালালের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা কম থাকলেও ব্যাঙ্ক বাড়তি টাকা দিয়ে দেয়, পরে দালালের কাছ থেকে নিয়ে নেয়। কিন্তু সম্প্রতি ফাটকা লাভের লোভে এত বেশিবার শেয়ার হাতবদল হচ্ছিল যে বাজার মাত্রাতিরিক্ত তেতে গিয়েছিল। মার্জিন মানিরও ঘাটতি হচ্ছিল। পতন আসন্ন এই আশঙ্কার মেঘ জমছিল বাজার জুড়ে। এই অবস্থায় 'কালো সোমবার' কয়েকটি প্রাইভেট ব্যাঙ্ক দালালদের বড় অঙ্কের চেক ফেরত দিয়ে দেয়, যা সাধারণ অবস্থায় তারা করে না। ব্যাঙ্ক বলে, পুরো টাকা আমানতে জমা না থাকলে তারা চেক ভাঙাবে না। কারণ ব্যাঙ্কের আশঙ্কা ছিল বাজার দ্রুত পড়ে গেলে টাকা তারা ফেরত নাও পেতে পারে। এর আগে শেয়ার বাজারে ধসের ফলে বেশ কয়েকজন দালালের আত্মহত্যার ঘটনাও সকলেরই জানা। এহেন অবস্থায়, ব্যাঙ্ক চেক ফেরত দেওয়ার ঘটনায় পতনশীল বাজারে ধসের আতঙ্ক আরও মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে, পরে দর আরও নেমে যাবে এই আশঙ্কায় শেয়ার দ্রুত বেচার হিড়িক পড়ে যায় এবং ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতা বেড়ে গিয়ে দর হু হু করে পড়তে থাকে ও তা ধসের আকার নেয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক কীভাবে কোটিপতি দালালদের (ব্রোকারদের)স্বার্থে কাজ করে তা এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার বেরিয়ে আসে। সাধারণ ঘরের একজন বেকার যুবক কোনমতে দু'মুঠো ভাতের যোগাড় করতে যদি ছোট ব্যবসা করার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে দশ-বিশ হাজার টাকা ঋণ চায়, তবে কানুনী ফাঁসে তার প্রাণ বেরিয়ে যায়। তারপর ঋণের শর্ত হিসাবে ব্যাঙ্ক মূল্যবান সম্পত্তি, জমিবাড়ি ইত্যাদি সিকিউরিটি (বন্ধক) চায়, যা দেওয়া প্রায়ই সম্ভব হয় না। ফসল মার খেলে ব্যাঙ্কঋণ চাষীর গলায় ফাঁস হয়ে এঁটে বসে। অথচ কোটি কোটি টাকার কারবারি ফাটকাবাজদের মুনাফার জন্য ব্যাঙ্ক কেবল মুখের কথায় কোটি কোটি টাকা দিয়ে দেয় শুধু নয়; এই ফাটকাবাজদের স্বার্থে সরকারই আইন-কানুন তৈরি করে ব্যাঙ্কপুঁজিকে ফাটকাবাজদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ব্যাঙ্ক কর্তারাও পুঁজি খাটাবার জায়গা না পেয়ে ফাটকাবাজদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে। আবার এই সরকারের কর্তারাই বলছে দেশে নাকি পুঁজির অভাব। বুদ্ধদেববাবু মার্কিন মুলুকে যাচ্ছেন পুঁজি ধরে আনতে। তাদের এই মিথ্যাচারের পেছনেও রয়েছে পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখার আগ্রহ। তাঁরা দেখাতে চাইছেন, পুঁজি খুব দুর্লভ জিনিস, অনেক কষ্টে তা পেতে হয়। তাই জনগণের ও শ্রমিকদের উচিত মালিকরা যা বলে তাই করা; লড়ালড়ি করে ন্যায্য দাবি তুললে মালিকরা চটে যাবে, তাই সকলের উচিত মালিকদের তোয়াজ করা।

বিদেশি পুঁজির পলায়ন ধসকে প্রলয়ঙ্কর করেছে

কোন কোন বাজার বিশেষজ্ঞ বলছেন, আচমকা বিদেশি বিনিয়োগ কমে আসার জন্যই নাকি বাজারে ধস নেমেছে। এদেশের শেয়ার বাজার যে চড় চড় করে উঠছিল তার অন্যতম কারণ ছিল বিপুল পরিমাণ বিদেশি পুঁজি শেয়ার বাজারে আগমন যা শেয়ারের চাহিদা বাড়াচ্ছিল। কেন্দ্রের ও রাজ্যের সরকার এখন বিদেশি পুঁজিকে দেশের ত্রাতা হিসাবে দেখায়। তারা বলে, পুঁজি এলে কলকারখানা হবে, লোকে চাকরি পাবে, জীবিকার নতুন নতুন রাস্তা হবে। আমরা আগে বারবার দেখিয়েছি, বিদেশি পুঁজির একটা বড় অংশই আসছে শেয়ারবাজারে, তারা পুরনো শেয়ার কিনেবেচে লাভ করছে। তাতে শিল্পও হচ্ছে না, কর্মসংস্থানও হচ্ছে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, শেয়ার বাজারে বিদেশি পুঁজি আসছে কেন? সাধারণ উত্তর হল — এখানে লাভ বেশি। একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ভারতের শেয়ার বাজারে লাভ ২১ শতাংশ, যা চীনে ও কোরিয়ায় ১৪ এবং তাইওয়ানে ১১ শতাংশ। (সূত্র ঃ প্রতিদিন, ২৬.৫.০৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার কম থাকায় এবং ভারতে মুনাফা বেশি ও তার ওপর কর কম হওয়ায় বিপুল হারে বিদেশি পুঁজি আসছিল এদেশের শেয়ার বাজারে। সিপিএম-এর সমর্থনে গদিয়ান কংগ্রেস সরকারও শেয়ার বাজারে মুনাফার ওপর কর কমিয়ে রেখেছে। বিজেপি সরকারও কর কম রেখেছিল। কেন তারা কর কমিয়ে রেখেছে? তার পিছনে একচেটিয়া মালিকদের কোন্ স্বার্থ কাজ করছে? বিষয়টা একটু ভেঙে বুঝতে হবে।

বিদেশি মুদ্রার সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের নেপথ্যে

এদেশে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায়শই জনগণকে বলে, তাদের সুপরিচালনার ফলে দেশের অর্থনীতি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার এখন কানায় কানায় ভরা। '৯০ সালে মনমোহন সিংহ যখন সর্বনাশা নয়া আর্থিক নীতি আনেন, তখন তিনি বলেছিলেন — দেশের বিদেশি মুদ্রার ভাঁড়ার শূন্য, মাত্র দিন সাতেকের আমদানির দাম মেটাবার মতো সামান্য পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা হাতে আছে। পুরনো নীতির ফলে রাজকোষ দেউলিয়া হয়ে গেছে। এমনকী মজুত সোনা পর্যন্ত বন্ধক দিতে হয়েছে। মনমোহন সিংহ বলেছিলেন, সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ হল নয়া আর্থিক নীতি, যার অন্যতম কর্মসূচি হল বিদেশি পুঁজির লুটের জন্য দেশের বাজার খুলে দেওয়া। এই ছিল নয়া আর্থিক নীতি চালু করার লক্ষ্যে তাদের অন্যতম অজুহাত।

আমরা তখনই বলেছিলাম, এসবই আসলে অজুহাত। আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার এমন শূন্য হল কেন? কারণ ইন্দিরা জমানার শেষ দিক থেকে, বিশেষত রাজীব জমানায় দেশের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে অর্থনীতির দরজা খোলার ফলে আমদানি বেড়ে গেছে অনেক। এদেশের কোটিপতিদের জীবনযাত্রায় মার্কিন মাপের আয়েশ আরাম আনতে বিদেশি যন্ত্র, বিলাসবহুল গাড়ি, প্রসাধন সামগ্রী থেকে শুরু করে বিদেশ থেকে নানা ধরনের পণ্য আমদানির জোয়ার বইয়ে দেওয়া হয়েছে। এদেশের বৃহৎ একচেটে মালিকরা বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াতে বিদেশি প্রযুক্তি চাইছে মুনাফা বাড়াবার স্বার্থে, আর কংগ্রেস আমদানির বিধিনিষেধ শিথিল করে তার ব্যবস্থা করছে। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, রপ্তানিজনিত আয়ের চেয়ে আমদানির জন্য ব্যয় বাড়তে থাকে। এভাবে তখনই বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারে একটা ফুটো করে দেওয়া হয়। পরবর্তী সরকারগুলি বিদেশি পুঁজিকে বাড়তি সুযোগসুবিধা দিয়ে দিয়ে সেই ফুটো কেবল বড়ই করে গিয়েছে। ফুটো জলপাত্র যদি সর্বদা ভরা রাখতে হয় তবে তার একমাত্র উপায় হল ক্রমাগত জল ঢেলে যাওয়া। ঠিক সেইটেই করছে কেন্দ্রের সরকার। ক্রমাগত বিদেশি ঋণ, বিদেশি আমানত এবং বিদেশি পুঁজিকে বেশি বেশি সুযোগ সুবিধা দিয়ে, মুনাফার ওপর কর কমিয়ে, ডলার অ্যাকাউন্টে সুদ বাড়িয়ে বিদেশি পুঁজি টানার ব্যবস্থা করেছে। সিপিএমও রাজ্যের 'উন্নয়নের' বচনের আড়ালে বিদেশি ঋণ এবং পুঁজি আনার চেষ্টা চালাচ্ছে পাল্লা দিয়ে। এই অবস্থা ততক্ষণই চলতে পারে যতক্ষণ বিদেশি পুঁজির আগমন অব্যাহত থাকে, কিন্তু তার সীমা আছে। সম্প্রতি মার্কিন সরকার প্রধানত যুদ্ধের বিপুল খরচের ফলে বাজেটের বিরাট ঘাটতি মেটাতে এবং মুদ্রাস্ফীতির হার সামাল দিতে মার্কিন ট্রেজারি বন্ডে সুদ বাড়াচ্ছে। ফলে উদ্বৃত্ত বিদেশি পুঁজির গন্তব্য বদলে যাচ্ছে। এর ফলে বিশ্বের নানা দেশের শেয়ার বাজারে বিদেশি পুঁজি আমদানি খানিকটা করে কমতে শুরু করেছে। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ভারতের শেয়ার বাজারে পতনের সপ্তাহে ১১ থেকে ১৮ মে-র মধ্যে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তুলে নেয়। 'কালো সোমবারে' একদিনেই এক হাজার কোটি টাকার বেশি শেয়ার তারা বেচে দেয়। এর ফলে বাজারে ধস নামে।

সিপিএম শীর্ষনেতার মন্তব্যের উদ্দেশ্য কী

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা উঠে এসেছে। মুনাফার ওপর কর কমিয়ে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শেয়ারে টাকা খাটানোকে 'বিনিয়োগ' হিসাবে চিহ্নিত করে, যার জন্য কর দিতে হয় মাত্র ১০ শতাংশ। অথচ বাস্তবে এরা করে বেচাকেনার কারবার, অর্থাৎ 'ট্রেডিং'। 'ট্রেডিং'-এর মুনাফায় করের হার ৪১ শতাংশ। মে মাসের মাঝামাঝি, বাজার যখন পড়ছে তখন ১৯ মে সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি হঠাৎ দাবি জানালেন, বিদেশি লগ্নিকারীদের 'ট্রেডার' হিসাবে গণ্য করে কর বাড়াতে হবে। কেন্দ্রের সরকারের ওপর সিপিএমের প্রভাব যে বিরাট তা সকলেই জানেন। সেই সিপিএমের অন্যতম শীর্ষ নেতার এহেন উক্তি শেয়ার বাজারের ধীর পতনকে ধসে পরিণত করেছে — বাজারবিশেষজ্ঞদের একাংশের এটা অভিমত।

এই ঘটনাকে ঘিরে আরও প্রশ্ন উঠছে। শেয়ার বাজারের কিছু খবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন, এই বাজারে দু'ধরনের খেলোয়াড় থাকে। যারা তেজিবাজারে লাভ করে, তাদের বলে তেজিওয়ালা

সাতের পাতায় দেখুন

সংরক্ষণ

তিনের পাতার পর

কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তোলে। শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে সারা দেশজুড়েই আন্দোলন চলছে। ইতিপূর্বে এ রাজ্যে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ১৫ শতাংশ আসন এন আর আই কোটার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন ফি-ভিত্তিক সংরক্ষণ চালু করেছিল। এর বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে লাগাতার আন্দোলন গড়ে ওঠে। ছাত্র আন্দোলন ও আইনি লড়াইয়ে সরকার পরাজিত হয়। ক্যাপিটেশন ফি, এন আর আই কোটা, বর্ধিত ফি ও শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনকে বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারলেই ধর্ম-বর্ণ-জনজাতি নির্বিশেষে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর কাছেই শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে যাবে, তাই আজ ছাত্রদের দাবি তুলতে হবে —

(১) ধর্ম-বর্ণ-জনজাতি নির্বিশেষে সমস্ত গরিব-মধ্যবিত্ত ছাত্রদের মেধা বিকাশ ও শিক্ষার সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

(২) শিক্ষায় ব্যবসায়ীকরণ ও বেসরকারিকরণের স্কীম বাতিল করে ক্যাপিটেশন ফি ও এন আর আই কোটা সহ সকল বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করতে হবে।

(৩) ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হবে।

(৪) ভর্তির ক্ষেত্রে আসনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা চলবে না।

(৫) সরকারকে ছাত্রছাত্রীদের ধর্ম-বর্ণ-ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত করার চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে।

(৬) শিক্ষা ও কাজের অধিকারকে সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি সাম্রাজ্যবাদী জোট ছাড়া কিছু নয়

চারের পাতার পর

পুনর্গঠনের জন্য সাহায্য ও ঋণদানের নামে দেশে দেশে বিপুল পরিমাণ পুঁজির রপ্তানি। একই সাথে শুরু হল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আগ্রাসনের ধুয়ো তুলে ইউরোপ রক্ষার অজুহাতে দেশে দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন। এই অজুহাতকে সামনে রেখেই সেখানে 'ন্যাটো' জোটের বিস্তার ঘটানো হল ও সামরিক দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলিকে ক্রমাগত ঘিরে ফেলা হতে থাকল।

ইউরোপের তখন প্রয়োজন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্যকে খর্ব করে নিজেদের বাজার পুনরুদ্ধার করা

ইউরোপীয় দেশগুলির সামনে তখন দেখা দিল এক দ্বিমুখী সমস্যা। একদিকে আগ্রাসী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ক্রমাগত তাদের উপর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রাধান্য বাড়িয়ে চলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, যার মোকাবিলা করা ছিল তাদের অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থে খুবই জরুরি। অপরদিকে, তাদের কাছে সমানভাবেই প্রয়োজনীয় ছিল নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকাগুলি পুনরুদ্ধার করা, যাতে ক্রমাগত বাড়তে থাকা সঙ্কটকে মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট বাজার তাদের নিজেদের হাতেই থকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর এইরকম এক পরিস্থিতিতেই ই ই সি-র উদ্ভব ও বিকাশ। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিকাশের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা ও তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত — এইসবের আলোকেই তাই আমাদের একে বিশ্লেষণ করতে হবে। সকলের জন্য বাজার (কমন মার্কেট), বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ নীতির প্রণয়ন বা পারস্পরিক শুল্কবিহীন বাণিজ্য প্রভৃতি যা কিছুই এর মাধ্যমে চালু করা হয়, সে সবেরই লক্ষ্য ছিল শেষ পর্যন্ত একই — তা হল বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি আনা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্ভব হলে মিলনের মাধ্যমে ঐসব দেশের বেসরকারি ও রাষ্ট্রীয় উভয় ধরনের একচেটিয়া পুঁজিরই বিপুল পরিমাণ শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করা, যাতে তারা মার্কিন পুঁজিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়ে পিছু হটতে বাধ্য করতে পারে এবং একই সাথে তাদের নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকা ক্রমাগত বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালাতে পারে। আর এসবের পিছনে আসল লক্ষ্য ছিল উত্তরোত্তর বাড়তে থাকা প্রবল অনিরসনীয় বাজার সঙ্কটকে কিছুটা সামলে ওঠার চেষ্টা। অর্থাৎ ই ই সি সংক্রান্ত এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ও ঘটনাপঞ্জিই আসলে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেরই একরকমের বহিঃপ্রকাশ — যার একদিকে রয়েছে বর্তমান প্রবল পরাক্রান্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হৃতগৌরব কিন্তু নিজেদের একটু গুছিয়ে নিয়ে আবার প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বও এর মধ্যে দিয়ে প্রায়শই সামনে এসে পড়ছে। কারণ, যদিও তাদের নিজেদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে গিয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় বহুজাতিকতাকে আশ্রয় করে নিজেদের পুঁজিকে ক্রমাগত একত্রিত করার মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনেই তাদের এই জোট গঠন — কিন্তু সবসময়েই তার মধ্যে বজায় থেকেছে নিজেদের জাতীয় স্বার্থের একটি চোরাস্রোত। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের এই বজায় থাকা জাতীয় স্বার্থের সাথে মিলিত পুঁজির বহুজাতিকতার স্বার্থের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় থেকে আজ পর্যন্ত ই ই সি-র ইতিহাস, যা বর্তমানে আরও শক্তিশালী ই ই ইউ — সবেরই পিছনে মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে চলেছে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের এই নিজস্ব আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই।

তাই যতই 'শান্তির প্রয়াস' বা নিজেদের মধ্যে 'বিরোধের অবসানের' কথা বলা হোক না কেন, তার দ্বারা বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বকে কখনও চেপে রাখা সম্ভব নয়। এই দ্বন্দ্ব ইতিহাস নির্ধারিত ও অবশ্যম্ভাবী এবং এর ভূমিকাও একইরকমভাবে অমোঘ ও ঐতিহাসিক। আবার নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে হাজার বিরোধ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে মিলও প্রচুর। ওই একটি জায়গায় তারা সবকিছু ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে। ঠিক এই কারণ থেকেই মার্কিন ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে এত বিরোধ সত্ত্বেও দেখা গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে তারা এককাট্টা। এই ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট 'ন্যাটো'-তে যোগ দিতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কোনও আপত্তি দেখা গেল না। কিন্তু তাই বলে এটা ভাবাও অত্যন্ত ভুল হবে যে, এই ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা নির্দ্বিধায় মার্কিন প্রাধান্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল। বরং তারা এই প্রাধান্য খর্ব করতেই যথেষ্ট উদগ্রীব ছিল। বিশ্বরাজনীতির বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখনই সঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছে, তখনই এই বিরোধ অনেকাংশে স্পষ্টরূপ ধারণ করে সামনে এসেছে। এমনকী বর্তমানের তথাকথিত একমেরু বিশ্বেও এর অন্যথা দেখা যায়নি। যেমন দেখা গেল ২০০৩ সালে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নগ্নভাবে ইরাক আক্রমণের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে আগ্রাসী ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে জার্মান বা ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধ অনেকটাই প্রকাশ্যে চলে আসে। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে একে একটি প্রায় রাষ্ট্রের রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টার পেছনে রয়েছে আসলে একে আরও ক্ষমতাশালী করে তোলার চেষ্টা, যাতে ইউরোপীয় শক্তিগুলি নিজেদের শক্তিকে আরও কেন্দ্রীভূত করে বর্তমান তথাকথিত একমেরু বিশ্বের বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে মার্কিন প্রাধান্যের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বই ই-ইউ-এর ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়েছে

তাই বলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই, এরকম মনে করারও কারণ নেই। বরং ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইতিহাসকে এক অর্থে এই দ্বন্দ্বেরই ইতিহাস বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। তাদের মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে এই সংঘাত কখনও প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ও সামনে চলে এসেছে, কখনও বা তাকে খানিকটা ঢেকে রাখা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু সবসময়েই তা বজায় থেকেছে, কখনও অবসান হয়নি। একেবারে প্রথম দিকেই ৬ দেশীয় ই ই সি এবং ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন এফটা (ই এফ টি এ)-র মধ্যে বিরোধের মধ্য দিয়েই তাদের স্বার্থের এই সংঘাত প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। পরবর্তীকালে এফটা-র সদস্য দেশগুলি যদিও ই ইউ-এ যোগদান করে, কিন্তু তাদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংঘাত চলতেই থাকে। বিশেষত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এবং ফরাসি ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা ই ইউ-এর মধ্যে তাদের পরস্পরবিরোধী অবস্থান বজায় রেখেই চলতে থাকে। নানা বিষয়ের মধ্য দিয়েই এই বিরোধের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়, যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজেট, সংবিধান প্রণয়ন বা কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকির ব্যাপারেও এর অন্যথা দেখা যায়নি। আবার উল্টোদিকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে অন্যান্য বৃহৎ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির স্বার্থেরও তীব্র দ্বন্দ্ব বর্তমান। এ ব্যাপারে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হল ফ্রান্স। কিন্তু ফরাসি সহ অন্যান্য সমস্ত প্রধান ইউরোপীয় শক্তিগুলিই বর্তমানে ই ইউ-এর উপর প্রবল শক্তিশালী জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের আশঙ্কায় চিন্তিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জার্মান সাম্রাজ্যবাদের ভূত এক্ষেত্রে তাদের পিছু ধাওয়া করে চলেছে।

অর্থাৎ ইউরোপ তথা বিশ্বের বিভিন্ন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের নানান জটিলতা ও স্বার্থ-সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের পূর্বতন ই ই সি এবং বর্তমান ই ইউ-এর উদ্ভব ও কার্যকলাপকে বুঝতে হবে ও তাদের বিশ্লেষণ করতে হবে। তাদের মূলগত শ্রেণীচরিত্র ও স্বার্থের দিক থেকে তারা ইউরোপীয় কিংবা মার্কিন নির্বিশেষে সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিরুদ্ধে সকলেই এককাট্টা। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জর্জরিত। সেখানে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের কাঁধের উপর থেকে মার্কিন আধিপত্যের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উপযুক্ত শক্তি সংগ্রহ করতে উদ্যোগী। আজকের ই ইউ বা তার পূর্বসূরী ই ই সি সেই উদ্যোগেরই ফসল। এর আরেক লক্ষ্য অবশ্যই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাদের হারানো বাজার ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করা। আবার তাদের নিজেদের মধ্যেও স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্বের কোনও কমতি নেই। তার একদিকে রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও অপরদিকে মূলত জার্মান ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অতীতের 'সূর্য না ডোবা' বিশালত্ব আজ শুধুই অতীত স্মৃতি কথা মাত্র। বর্তমানে তার কোনও অস্তিত্বই নেই। আজ শুধুমাত্র নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থেই ইউরোপীয় কমন মার্কেটে তাদের অংশীদারিত্ব চাই। তাই ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের ক্রমশ ঐক্যবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে যে বিপুল শক্তিসঞ্চয়ের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাকে উপেক্ষা করার মতো শক্তি আজ আর তাদের কোনওভাবেই নেই। অবস্থার নিরিখে কিছুটা বাধ্য হয়ে তাই তাদের যোগ দিতে হয়েছে ই ই সি-তে। কিন্তু, ঐতিহাসিক ভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ছিল নিজেদের দ্বীপরাষ্ট্রটির মতোই স্বার্থের দিক থেকে মূল ইউরোপ থেকে চিরকালই খানিকটা বিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে তাদেরও যখন বাকি ইউরোপের মতোই ফের নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালাতে হচ্ছিল, তাদের মানসিকতায় কিন্তু তখনও এই বিচ্ছিন্নতার রেশটুকু বজায় ছিল। ফলে এক্ষেত্রেও তারা প্রথম থেকেই উদীয়মান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করেছিল। তাই ই ই সি-র মধ্যেও তাদের ভূমিকা হয়ে দাঁড়াল খুব স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা মার্কিন স্বার্থের ইউরোপীয় প্রবক্তার মতোই। তাদের ঠিক এই অবস্থান থেকেই গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে তারা প্রস্তাব তুলেছিল যে প্রস্তাবিত ইউরোপীয় কমন মার্কেটকে আরও প্রসারিত করে ট্রান্স-আটলান্টিক করে তুলতে হবে, আর ঠিক সেই একই জায়গা থেকে আজ এই একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও তারা মার্কিন নেতৃত্বে পৃথিবীর দেশে দেশে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র সবচেয়ে উৎসাহী অংশীদার। আবার, আমরা আগেই দেখেছি যে, অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরাও কখনই পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। তাদের মধ্যেও নিজেদের স্বার্থ নিয়ে যথেষ্ট দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। এই সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতই আসলে বিশ্বপুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ। এইসব দ্বন্দ্বের মধ্যে কোন্‌টা কখন প্রধান হয়ে উঠবে, তা নির্ভর করে সেই বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে অন্যান্য শর্তগুলি কীভাবে অবস্থান করছে — তার উপর ও তাদের মধ্যেকার জটিল সম্পর্কের উপর। তাই কখনও আমরা দেখি কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে কোনও বিশেষ মুহূর্তে মার্কিন ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসেছে, আবার কখনও দেখা যায় আরেকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আরেক মুহূর্তে তাদের অবস্থান পরস্পর বিপরীতমুখী। কখনও বা এমনও দেখা যায় যে, কোনও একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে একজন অপরজনের স্বার্থের প্রাধান্যকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু তার মানে কখনই এরকম দাঁড়ায় না যে, আজ এই মুহূর্তে যে মাথা নত করে নিতে বাধ্য হল কালকে আরেকটি কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্যদের উপর তারই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। এখন মনে রাখার বিষয় হল এই যে, এইসব দ্বন্দ্ব যদিও এখনও পর্যন্ত শান্তির সীমার মধ্যেই অবস্থান করছে, চরিত্রের দিক থেকে কিন্তু এরা পুরোপুরি বিরোধাত্মক। কারণ এইসব কিছুর মূলেই রয়েছে সঙ্কট জর্জরিত বিশ্বপুঁজিবাদী অর্থনীতি, যার সর্বগ্রাসী হাঁ থেকে নিজ নিজ অর্থনীতিকে রক্ষার বেপরোয়া তাগিদ তাদের যেকোনও মুহূর্তে আবার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে পারে যুদ্ধং দেহি মেজাজে। গত শতাব্দীর দুটি বিশ্বযুদ্ধেরই পিছনে মূল কারণ ছিল এগুলিই এবং এই কারণগুলি থেকে উৎপন্ন যুদ্ধেই দু-দুবার ঐরকম ভয়ঙ্করভাবে সারা পৃথিবী ছারখার হয়ে যায়। বর্তমান বিশ্বেও আবার এই কারণগুলির অবস্থিতিই বুঝিয়ে দেয় যে যুদ্ধের বিপদ কীভাবে এখনও মাথার উপর ঝুলছে। ঠিক এই পটভূমিকা থেকেই লেনিন বলেছিলেন যে 'সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবেই যুদ্ধের জন্ম দেয়।' একথা গত দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময় যেমন সত্য ছিল, আজকের এই তথাকথিত একমেরু বিশ্বেও তা সমানভাবেই সত্য।

এর পাশাপাশি রয়েছে আরেক দ্বন্দ্ব। তার একদিকে রয়েছে ইউরোপের প্রবল শক্তিশালী বিভিন্ন বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি, আর অন্যদিকে রয়েছে বিশ্বের নানাপ্রান্তে ছড়ানো অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশ। এরা প্রায় সবাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর স্বাধীন হয়েছিল। এদের মধ্যে কিছু দেশ, যেমন ভারত কিন্তু ইতিমধ্যেই যথেষ্ট শক্তিসঞ্চয় করে ফেলেছে এবং এদের অর্থনীতিও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে ফেলেছে। এরাও এখন বিদেশের বাজারে লগ্নি পুঁজি রপ্তানি করছে এবং এশিয়া, আফ্রিকা, এবং এমনকী ইউরোপেরও অপেক্ষাকৃত দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলি থেকে নির্বিচারে কাঁচামাল ও সস্তা শ্রম লুঠ ও সেসব দেশের বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। এদেরই লক্ষ্য করে, বিশেষত পুঁজিবাদী চীন, ভারত ও অন্যান্য এশীয় দেশের ''বিকাশশীল অর্থনীতি''র কথা ভেবেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গত জুন মাসের মাঝামাঝি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যর্থ শীর্ষসম্মেলনে ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে সাবধান করে দেন এই বলে যে, তাদের এই সঙ্কটদীর্ণ সময়ে এই শক্তিগুলির বিকাশশীল অর্থনীতি তাদের সামনে এক নতুন বিপদের সম্ভাবনা সূচিত করেছে। আবার পাশাপাশি একই সাথে বিশ্ববাজারে নিজেদের ভাগ বজায় রাখতে ও সেই ভাগ যথাসম্ভব বৃদ্ধি করতে ইউরোপীয় দেশগুলি এইসব দেশগুলির সাথে নানারকম বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনে ও বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতেও খুবই আগ্রহী। ফরাসি ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভারত সফরের সময় দুই তরফের পরস্পর পিঠচাপড়ানো বিবৃতিই তার প্রমাণ। সঙ্কুচিত ও সঙ্কট জর্জরিত বিশ্ববাজারের দখল নিয়ে শক্তিশালী বনেদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সাথে নতুন উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির এই দ্বন্দ্বও কিন্তু আজ কোনও কোনও ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিশ্বপরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে নাহলেও অন্তত আঞ্চলিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(ক্রমশ)

এডস্ নিয়ে অশ্লীল বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া রেডিও'য় ডেপুটেশন

এডস্ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে এডস্ নিয়ন্ত্রণের নামে রেডিও-টিভি সহ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে যে অশ্লীল ও কুরুচিকর বিজ্ঞাপন প্রচার করে চলেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন (এ আই এম এস এস), যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও, ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও। ২৩ মে তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল আকাশবাণীর কলকাতা স্টেশন অধিকর্তাকে স্মারকলিপি প্রদান করে এই অশ্লীল প্রচার বন্ধের দাবি জানিয়েছে। ঐ স্মারকলিপিতে প্রতিনিধিরা বলেছেন, আমরা এডস্ নিয়ন্ত্রণের বিরোধী নই। তবে এই বিজ্ঞাপন যেভাবে প্রচারিত হচ্ছে তা অত্যন্ত অশ্লীল ও কুরুচিকর।

আরও বলা হয়েছে, সংবাদ প্রকাশ থেকে শুরু করে আকাশবাণীর যেকোনো অনুষ্ঠানের মাঝে এমনভাবে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে যার ফলে পারিবারিক ও সামাজিক সুস্থিতি ও সংস্কৃতি বিঘ্নিত হচ্ছে। এতে রাজ্যের আপামর সাধারণ মানুষ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। প্রসঙ্গত রাজ্য সরকার স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করেছে। এই প্রচার ছাত্রছাত্রী যুবকযুবতীদের মধ্যে এডস্ সচেতনতা বৃদ্ধির নামে তাদের মধ্যে আদিম প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দিতে সাহায্য করছে। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, আর্সেনিকের আক্রমণে, ডায়েরিয়া, কলেরা, টিবি, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে সর্বাধিক মানুষ মারা যাচ্ছে, তার প্রতিকারে রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না। বিভিন্ন বিশ্বসংস্থা এবং কন্ডোম প্রস্তুতকারক মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি থেকে মোটা টাকা পাওয়ার লোভে এডস্ নিয়ে এই নোংরা মাতামাতি চলছে। এই প্রচার কিশোর মনকে বিপথে চালিত করবে, যা খুবই উদ্বেগজনক। শাসকশ্রেণীর মদতে সমাজের নৈতিক মান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এদিনের ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কৃষ্ণা সেন, এ আই ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জ্ঞানতোষ প্রামাণিক এবং এ আই ডি এস ও-র রাজ্য কাউন্সিল সদস্য কমরেড ইমতিয়াজ আলম। আকাশবাণীর অধিকর্তা বলেন, আপনারাই সর্বপ্রথম এবিষয়ে আপত্তি জানালেন এবং আপনাদের বক্তব্য সঠিক। তিনি স্বাস্থ্যবিভাগকেও এ বিষয়ে অবহিত করার জন্য বলেন। তিনি যত দ্রুত সম্ভব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে এসব বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আপনাদের চিঠি পেয়ে ইতিমধ্যেই আমরা বিজ্ঞাপনের অশ্লীল অংশগুলি বাদ দিয়েছি।

শেয়ার বাজারে ধস

পাঁচের পাতার পর

(বুল), মন্দার বাজারে যারা লাভ করে, অর্থাৎ দর পড়লে কিনে বেশি দামে বেচে, তাদের বলে মন্দীওয়ালা (বিয়ার)। দৈনিক স্টেটসম্যানের কলমচি শেখ সদর নাইম ২৫ মে এক প্রবন্ধে প্রশ্ন করেছেন — ''এমন নয় যে, ইয়েচুরি তাঁর বক্তব্যের সম্ভাব্য পরিণাম অনুধাবন করতে অপারগ। তাই প্রশ্ন জাগে, বাজারকে অস্বাভাবিক মাত্রায় নিচে নামিয়ে কাদের স্বার্থ রক্ষা করছেন উনি?'' প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে সরাসরি বলতে না পারলেও ইঙ্গিত মোটেই অস্পষ্ট নয়। এর অর্থ দাঁড়ায় — মন্দীওয়ালা ফাটকা লবির মুনাফার স্বার্থেই কি সীতারাম ইয়েচুরি এমন বিপজ্জনক মন্তব্য করেছেন? সন্দেহটা অমূলক নয়।

ধস দেখিয়ে দিল সরকার গরিবের নয়

লক্ষণীয় হল — ইয়েচুরির মন্তব্যের পর ধস নামার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রথমেই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করে বলেছেন — সরকার কর বাড়াবার কথা ভাবছে না। সরকারি সাহায্য দিয়ে ধস ঠেকাতে তৎক্ষণাৎ অর্থমন্ত্রী বলেছেন — ব্যাঙ্কগুলির যাতে অর্থাভাব না হয় সেটা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেখবে। অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকা ঢেলে শেয়ার বাজারে চাহিদা বাড়াবে। জানা গেছে, সরকারি নির্দেশে এল আই সি এবং ইউনিট ট্রাস্ট নতুন করে ৫০০০ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছে বাজারদর চড়াতে। এথেকেই বোঝা যায় এই সরকার কাদের সরকার। জনগণের জরুরি প্রয়োজনে এরাই বলে — টাকা নেই। অথচ এল আই সি বা ইউনিট ট্রাস্টের পুঁজির বড় অংশই তো জনগণের টাকা; অকাতরে সেই টাকা দিয়ে শেয়ার বাজারের ধস সামলাতে অকুণ্ঠ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এভাবেই সাম্প্রতিক অতীতে শেয়ার বাজারে ঢুকিয়ে ইউনিট ৬৪ স্কিমকে ডুবিয়েছিল সরকার-মালিক অশুভচক্র। অসংখ্য গরিব মানুষ সরকারি গ্যারান্টির ভরসায় এই স্কিমে দু-দশ হাজার টাকার সঞ্চয় রেখেছিলেন। ইউনিট-৬৪'র প্রকৃত মূল্য পড়ে যাওয়ায় তাঁরা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এই দৃষ্টান্তই বলে দেয়, শেয়ার বাজারে ধস নামলে গরিব মানুষের কোন ক্ষতি নেই, কেবল কোটিপতি শেয়ার ফাটকাবাজরাই লোকসান খাবে — এগুলি মিথ্যা প্রচার। দেখা যাচ্ছে, সরকার নিজে সরকার নিয়ন্ত্রিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, এল আই সি, ইউনিট ট্রাস্টের পুঁজি ঢেলে কোটিপতিদের বাঁচাতে নেমেছে। এর ফলে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী যাঁরা এল আই সি বা ইউনিট ট্রাস্টে টাকা রেখেছেন তাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাছাড়া বিদেশি পুঁজির মালিকরা শেয়ার বেচে তাদের পুঁজি তুলে নেওয়ার জন্য বাজারে ডলারের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ডলারের তুলনায় টাকার দাম একদিনে ১৭ পয়সা কমে গিয়েছে। এর অর্থ হল, বিশ্ববাজারে তেলের দাম ডলার মূল্যে একই থাকলেও টাকার অঙ্কে তার দাম বেড়ে যাবে। এর ফলে পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন, সার, কীটনাশক সহ চাষের নানা দ্রব্য সহ সমস্ত আমদানি দ্রব্য, পরিবহন খরচ সব বাড়বে। এর দায় বর্তাবে গরিব মানুষের উপর। স্বাভাবিকভাবে যেটুকু দায় বর্তাবে তার ওপর সরকার পরিকল্পিতভাবে সঙ্কটের সমস্ত দায় সাধারণ মানুষের ওপর চাপাবে। কাজেই শেয়ার বাজারে যাঁরা টাকা খাটান না, তাদের কিছু যায় আসে না — এমন সরলীকৃত ধারণা দিয়ে পুঁজিবাদের আসল চেহারা বোঝা যাবে না। সমস্ত সঙ্কটের ফলেই এখানে গরিব ও মধ্যবিত্তকেই শেষ অবধি মরতে হয় — পুঁজিবাদের এই হল চরিত্র।

বাজার আবার নিজেই নিজেকে সামলে নেবে — একথা বলে যাঁরা জনগণকে আশ্বস্ত করছেন তাঁরাও যেটা আড়াল করছেন তা হল — এবার সামলাতে পারলেও বারবার কী সামলানো যাবে? বলাবাহুল্য এই ধস ভবিষ্যতের অশনি সঙ্কেত। ভারতীয় পুঁজিবাদ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার 'টাইগার'দের চেয়ে অনেক শক্তিশালী হওয়ায়, জনগণকে আরও দুর্দশায় ফেলে পুঁজিবাদকে টিঁকিয়ে রাখার ক্ষমতা ভারতের বেশি। কিন্তু তারও সীমা আছে। সর্বোপরি প্রশ্ন — যে পুঁজিবাদ নিজেকে বাঁচানোর জন্য জনগণকে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে, মানুষ কতদিন তাকে সহ্য করবে?

অসাম্য দূর করার জন্য মাও সে-তুং-এর লাইন ছিল সঠিক

— অভিমত চীনের মানুষের

বুর্জোয়া কাগজগুলি প্রায়ই দেখাবার চেষ্টা করে সমাজতান্ত্রিক দেশের জনমনে সেখানকার শীর্ষ নেতাদের আর ঠাঁই নেই। ১৭ মে আনন্দবাজার পত্রিকা এমন চেষ্টাই করেছিল, চীনে মাও সে তুংয়ের ঐতিহাসিক ছবি নিলামে উঠছে — এই খবর মাও সে-তুংয়ের ছবি সহ বড় করে ছেপে। ২৭ মে সেই আনন্দবাজার ছোট্ট করে সংবাদ দিয়েছে হাজার হাজার মানুষের প্রতিবাদে কর্তৃপক্ষ সেই ছবির নিলাম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান নেতা মাও সে-তুং-এর বিরুদ্ধে বিপ্লবের শত্রুরা, বুর্জোয়ারা এবং মার্কসবাদের আলখাল্লা পরা সংশোধনবাদীরা হাজার কুৎসা রটিয়েও সারা বিশ্বের মুক্তিকামী শোষিত মানুষের মন থেকে, বিশেষ করে চীনের শ্রমিক-চাষীর কাছ থেকে প্রিয় চেয়ারম্যান মাওয়ের স্মৃতি আজও মুছে দিতে পারেনি। মাও সে-তুং-এর জীবনাবসানের পর সংশোধনবাদীরা ধীরে ধীরে পার্টির ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে, মার্কসবাদের চর্চা মেরে দিয়ে, শ্রেণীসংগ্রামকে গুরুত্বহীন করার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে — এটা যেমন গভীর বেদনার, তেমনই আনন্দের কথা হল মানুষ অতি দ্রুত সমাজতন্ত্র ধ্বংসের পরিণামে জনজীবনে নেমে আসা সঙ্কটের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে। চীনের মানুষ গভীর ব্যথায় লক্ষ্য করছে, সমাজতন্ত্র যে দারিদ্র্যকে সমাজের বুক থেকে মুছে দিয়েছিল তা এখন চীনে জাঁকিয়ে বসেছে। বাড়ছে দুর্নীতি। পেনশন নেই, কাজ নেই। গত এক বছরে চীনে ৮৭ হাজার বিক্ষোভ সমাবেশ-মিছিল হয়েছে। চীনের শ্রমিক-কৃষক সমাজ আজও মাও সে-তুং-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁরা মনে করেন, অসাম্য দূর করার জন্য মাও সে-তুং-এর পথ ছিল সঠিক। চীনের বর্তমান শাসকরা মাও সে-তুং-এর স্মৃতি ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য ঐতিহাসিক তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে রাখা তাঁর ছবির মূল মডেলটি নিলামে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু গণআপত্তিতে শেষপর্যন্ত সরকারকে পিছু হটতে হয়েছে।

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি কি আদৌ প্রয়োজন

একের পাতার পর

বাজারে তেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৭০.৪ ডলার। এই কারণে দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হলে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী হিসাব করে দেখা গেছে, পেট্রলের দাম হতে পারে ২৯.২৬ টাকা এবং ডিজেলের দাম হতে পারে ৩০.২৮ টাকা। জয়েন্ট কাউন্সিল অব বাস ওনার্স-এর পক্ষে সাধন দাস বলেছেন, ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ২১ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয় (সংবাদ প্রতিদিন, ২৯-৫-০৬)। বর্তমানে পেট্রলের দাম ৪৬.৯০ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৩২.৮৭ টাকা। ইতিমধ্যেই যেখানে তেলের দাম বেশি সেখানে আবার নতুন করে দাম বৃদ্ধির প্রশ্ন উঠছে কেন? তাছাড়া অশোধিত তেল থেকে শুধু পেট্রল-ডিজেলই নয়, বেঞ্জিন-টলুইন সহ আরও নানা উপজাত দ্রব্য তৈরি হয় যার দামও প্রচুর। এখান থেকেও প্রচুর আয় হয়। সুতরাং তেল কোম্পানিগুলির লোকসানের কথা একটা গল্প ছাড়া কিছুই নয়। তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলনের অভাব থাকার সুযোগ নিয়ে সরকার আয় বাড়াতে বারবার পেট্রল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির পথে যাচ্ছে। কারণ পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়লে সরকারের ট্যাক্সও বাড়ে। ২০০২-০৩ সালে সরকার পেট্রল-ডিজেল থেকে ট্যাক্স বাবদ আয় করেছে ৯৬ হাজার ৭৫১ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ সালে এই আয় বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা (সূত্রঃ গণশক্তি ১৬-৫-০৬)। পেট্রল ডিজেলের দামবৃদ্ধির ফলে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হন, বাড়ানো হয় পরিবহনের ভাড়া, কৃষকের সেচের খরচ বাড়ে। সরকার আয় বাড়ানোর জন্য এভাবে জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপাচ্ছে। অন্যদিকে বৃহৎ শিল্পপতিদের বিরাট অঙ্কের ট্যাক্স মকুব করে দিচ্ছে। ২০০৪-০৫ সালে এই কর ছাড়ের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৬১ কোটি টাকা (সূত্র ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা, ২০০৬)। সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা চাপিয়ে সরকার পুঁজিপতিদের বিপুল ট্যাক্স ছাড় দেবে আর জনসাধারণ তা বহন করে যাবে — এ জিনিস চলতে পারে না।

ত্রিপুরা

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আন্ত্রিক-ম্যালেরিয়া মোকাবিলার দাবিতে এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন

ত্রিপুরাতেও সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার যখন উন্নয়নের ঢাক পেটাচ্ছে তখন খোদ আগরতলা আই জি এম হাসপাতালেই চিকিৎসার অবহেলায় ১৩৮ জন শিশুর মৃত্যু ঘটেছে। এ সত্য সরকারি তদন্ত কমিটি স্বীকার করেছে। রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। গ্রামাঞ্চলে, পাহাড়ী এলাকায় আন্ত্রিক ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বহু মানুষ মারা গেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার উদাসীন। এই অবস্থায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আন্ত্রিক ও ম্যালেরিয়া মোকাবিলা করা, মৃত শিশুদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিরোধ এবং প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি বন্ধের দাবিতে ১৫ মে এস ইউ সি আই ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি আগরতলায় এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। কর্নেল চৌমুহনি থেকে মিছিল বটতলায় পৌঁছালে সেখানে এক সভায় রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেডস্ সঞ্জয় চৌধুরী ও সুব্রত চক্রবর্তী সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। বক্তারা বলেন, এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের চাপে সরকার সর্বনাশা 'নোডাল' ব্যবস্থা বাতিল করলেও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দিয়ে শিক্ষার ভিত্তি ধ্বসিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই পরিচালিত আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তাঁরা।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

বহির্বিশ্বেও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রসার

তুরস্কের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি এম এল কে পি এযুগের অগ্রগণ্য মার্ক্সবাদী দার্শনিক, এস ইউ সি আই দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ রচিত ''আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতাদের উদ্দেশে একটি আবেদন'' এবং ''সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্যালিনবিরোধী পদক্ষেপ প্রসঙ্গে'' পুস্তিকা দুটির তুর্কি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেছে। উক্ত পুস্তিকা দুটির প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত হল। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে জার্মানীতে কমিউনিস্ট পার্টি অব ডয়েশল্যান্ড (বলশেভিক) জার্মান ভাষায় দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রকাশ করেছে।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এ আই ডি এস ও

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পাওয়ার পরই ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে কর্তৃপক্ষ এক ধাক্কায় আসন সংখ্যা অর্ধেক করে দেয়। এর বিরুদ্ধে এবং ভর্তি ফর্মের অত্যধিক দাম ও অন্যান্য ফি কমানোর দাবিতে এ আই ডি এস ও তীব্র আন্দোলনে সামিল হয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে। অপরদিকে আন্দোলনকে বিপথগামী করার দুরভিসন্ধি নিয়ে কর্তৃপক্ষ ওবিসি'র জন্য আসন সংরক্ষণ ঘোষণা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধাবাদী ছাত্র ইউনিয়ন আসন সংখ্যা বৃদ্ধির মূল দাবি পাশ কাটিয়ে যেতে থাকে। এ আই ডি এস ও-ই একমাত্র ছাত্র সংগঠন যে সুনির্দিষ্টভাবে আসন সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে উপাচার্য, জেলাশাসক এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। কিন্তু উপাচার্য এই দাবির প্রতি কর্ণপাতই না করায় ২ মে এ আই ডি এস ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কালাদিবস' পালন করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে তৃণমূল স্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। সংরক্ষণের পক্ষে ও বিপক্ষে যখন বিতর্ক চলছে তখন এ আই ডি এস ও উত্থাপিত শিক্ষা আন্দোলনের সঠিক লাইন ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

বীরভূমে ফি-বৃদ্ধি ও ডোনেশনের প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলনের জয়

মুরারই অক্ষয়কুমার ইনস্টিটিউশনে একাদশ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে ১৫৭ টাকা ডোনেশন সহ অন্যান্য ফি বাবদ ৩১৫ টাকা নেওয়ার অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্র সংগঠন ডি এস ও'র নেতৃত্বে একাদশ শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র প্রধান শিক্ষকের নিকট জমা দেওয়া হয়। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের দাবি না মানায় ২২ মে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মিছিল করে পুনরায় প্রধান শিক্ষক এবং বি ডি ও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিডিও ছাত্রছাত্রীদের যুক্তি মেনে নেন ও প্রধান শিক্ষককে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠি দেন। তা সত্ত্বেও স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। প্রতিবাদে ২৩ মে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বয়কট করে ছাত্র ধর্মঘটের হুমকি দেয়। অবশেষে স্কুল কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি মিটিং-এ বসে এবং ডোনেশন বাবদ ১০০ টাকা কম নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা তাদের সম্পূর্ণ দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ডি এস ও সংগঠক কমরেডস্ যুথিকা ধীবর, ভরত রবিদাস, সেমিম আকতার প্রমুখ।

শিল্পায়নের নামে দু'তিন ফসলি জমি থেকে চাষীদের উচ্ছেদ করা চলবে না

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৯ মে এক প্রেস বিবৃতিতে জানান —

''রাজ্যে যখন হাজার হাজার শিল্প বন্ধ ও লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে চলেছে, তখন দু'পাঁচটা শিল্প গড়া বা তার প্রস্তাব দেখিয়ে সিপিএম ও রাজ্য সরকার 'শিল্পায়ন' হচ্ছে বলে হৈ চৈ করছে।

এরই অজুহাতে লক্ষ লক্ষ চাষীকে জমি ও ভিটে থেকে উচ্ছেদ করছে। রাজারহাট সহ ইতিমধ্যে যেখানে উচ্ছেদ করেছে, সেখানেই উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না পেয়ে উচ্ছেদ হওয়া কৃষকরা নিরাশ্রয় ও অনাহারে ধুঁকছে।

গঙ্গার দু'ধারে বন্ধ শিল্পের চল্লিশ হাজার একর সরকারি জমিতে নতুন শিল্প হতে পারতো কিন্তু তা না করে সরকার মালিকদের প্রমোটার দিয়ে আবাসন ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে অকৃষি, অনাবাদী জমিতেও শিল্প হতে পারতো, কিন্তু তা না করে দুই/তিন ফসলি জমি থেকে চাষীকে উচ্ছেদ করছে।

শিল্পোদ্যোগীরা দয়া করে পুঁজি বিনিয়োগ করে না, তারা মুনাফার জন্যই করে। কোথায় করবে এ ব্যাপারে কি তারাই চূড়ান্ত নির্দ্ধারক হবে? যদি ফোর্ড কোম্পানি সল্টলেকে মোটর কারখানা করতে চায়, তাহলে কি এখানকার বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করা হবে?

এমনিতে প্রতি বছর নগরায়ন ও অন্যান্য কারণে পঞ্চাশ হাজার একর কৃষিজমি কমছে, সরকারের এই সর্বনাশা কার্যক্রমের ফলে আরও ব্যাপক কৃষি জমি ধ্বংস হবে। আমরা সরকারের এই কৃষক-খেতমজুর উচ্ছেদকারী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যমত হয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।''

সংগ্রামী ইউনিয়ন করার জন্য সাসপেন্ড শ্রমিককে পুনর্বহাল করতে বাধ্য হল এভারেস্ট কর্তৃপক্ষ

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বে দাবি আদায়ে বদ্ধপরিকর শ্রমিক আন্দোলনের জোরে অন্যায়ভাবে সাসপেন্ড হওয়া শ্রমিক পরশুরাম গুপ্তাকে কাজে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হল এভারেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজের কর্তৃপক্ষ।

ঘটনাস্থল গার্ডেনরিচ, বামফ্রন্টের শিল্পায়নের প্রচারের আলোর পাশে জমাট আঁধারের মতো বন্ধ কারখানার সারি এখানে। আপাত শান্তির সেই শ্মশানে ৯৫ শতাংশ শ্রমিকই কর্মহীন, নিরুপায়। সিটু, ইনটাক, এইচ এম কে পি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলি শ্রমিকের দাবি নিয়ে লড়াই ছেড়ে দিয়েছে। এভারেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজের শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলির নির্বীর্য ভূমিকায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৯ মাস আগে ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর নেতৃত্বে এভারেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠন করে। এতে আশঙ্কিত কর্তৃপক্ষ অগ্রণী শ্রমিক পরশুরাম গুপ্তাকে সাসপেন্ড করে এবং অপর কয়েকজনকে চার্জশিট দিয়ে শ্রমিকদের মনোবল ভাঙার অপচেষ্টা শুরু করে। লড়াকু শ্রমিকরা অদম্য মনোবলে ইউনিয়নের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য নির্বাচন করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে। নির্বাচনে ৫৫ শতাংশ ভোট পেয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অপর তিনটি ইউনিয়নকে পরাজিত করে, সোল বারগেইনার-এর (শ্রমিক স্বার্থে দরকষাকষির একমাত্র অধিকারী) স্বীকৃতি পায়।

গত ৬ বছর শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মালিকরা ফেলে রেখেছিল বৃহৎ ইউনিয়নগুলির নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে। ইউ টি ইউ সি-এল এস শ্রমিকদের বকেয়া ন্যায্য দাবিগুলি ও সাসপেনশান প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের চাপে গত ৫ মে লেবার কমিশনার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন এবং ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ পরশুরাম গুপ্তাকে কাজে ফেরানোর দাবি মেনে নেয়। শ্রমিক আন্দোলনের এই বিজয়ে শ্রমিকদের মধ্যে উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে শাসক ও বিরোধী বুর্জোয়া দল ও গণমাধ্যম যখন সোচ্চারে বলছে — ''আন্দোলন করে কিছু হবে না, ওটা আত্মঘাতী পথ'' তখন শ্রমিক দেখছে আত্মরক্ষার একটাই পথ — তা হল সংগ্রাম। লড়াই করে ফিরে পাওয়া চাকরিতে যোগ দিতে এলে ২৫ তারিখ কারখানা গেটে আনন্দে উদ্বেল শ্রমিকরা পরশুরামকে বুকে টেনে নেয়।

ঐদিন দুটোয় বিজয় উপলক্ষে গেটসভা হয়। ইউনিয়ন সম্পাদক ওমপ্রকাশ চৌবে — সংগ্রামের পিছনে সঠিক রাজনীতির গুরুত্ব তুলে ধরে সকল শ্রমিককে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পতাকাতলে সমবেত হতে ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার চর্চা করতে আহ্বান জানান। গেট সভা থেকে ইউ টি ইউ সি-এল এস কলকাতা জেলা সম্পাদক শান্তি ঘোষের নেতৃত্বে শ্রমিকদের বিজয় মিছিল ব্যানার্জীবাগান ও ফতেপুর ঘুরে বাঁধাবটতলায় এলে তা শ্রমিক সভায় পরিণত হয়। শ্মশানপ্রায় এই শিল্পাঞ্চলের ঘরে ঘরে বেকার; অনাহার এখানে নিত্যসঙ্গী। এই অবস্থায় নিরুপায় শ্রমিকদের বুকে এভারেস্টের লড়াই ও বিজয় আবার আশার দীপ জ্বালিয়েছে। ইউ টি ইউ সি-এল এস কী বলে, তা তাঁরা জানতে চান। বাঁধাবটতলার শ্রমিক সভায় কমরেড শান্তি ঘোষ, সঠিক রাজনীতি বুঝে বুকের ব্যথাকে সংগ্রামী চেতনায় রূপান্তরিত করার আহ্বান জানান।

মুরারই কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন কমরেড মঙ্গল হেমব্রম

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মুরারই কেন্দ্রে এস ইউ সি আই-এর প্রার্থী ছিলেন কমরেড মঙ্গল হেমব্রম। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৩,৩৭৫। গত সংখ্যায় এ সংক্রান্ত সংবাদে কিছু ভুল ছিল।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in